চাঁদতারা
বর্ষা ১৪১৭
এক দান নষ্ট
এক দান নষ্ট
ছোটদের সেরা ত্রৈমাসিক

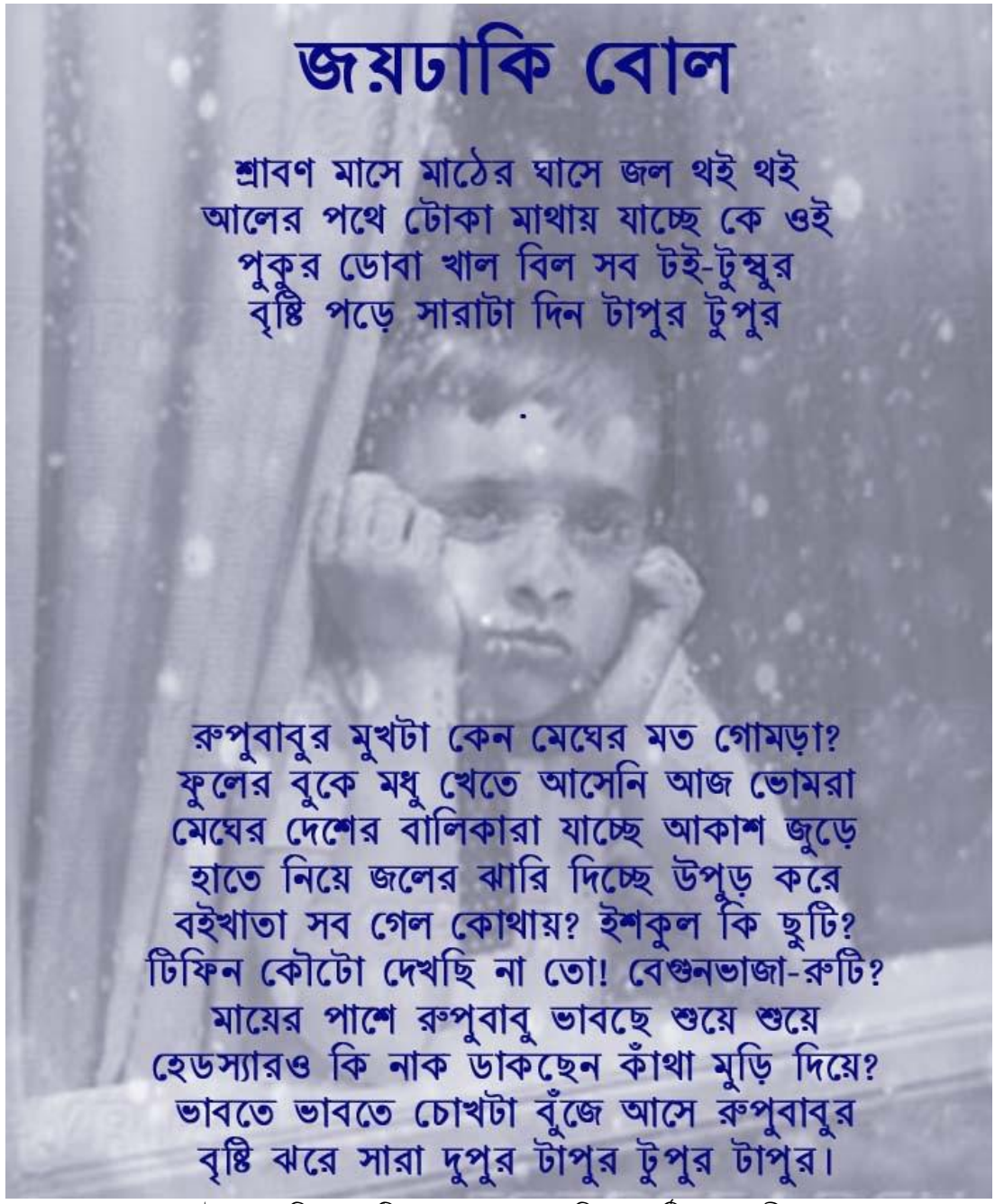

এবারের এই জয়ঢাকি বোলটি তোমাদের জন্য লিখে পাঠিয়েছেন শ্রী শেখর রায়। কেমন লাগলো তোমাদের জানিও। ভালো থেকো সবাই মিলে এই বর্ষায়।

তোমাদের জয়ঢাকি দাদারা।

সূর্য ওঠার রাজ্য অরুণাচলে এক ম্যাজিক ভ্রমণের শেষ পর্বে চীন ভারত সীমান্তে গিয়ে পৌঁছোলেন তিনি। এই পর্বে সেই গল্প।

২৮/৪/০৩

সকাল ৭:৩০-এ যাত্রা শুরু হল। প্রথমে হাবিলদার মেজরের পরিচয় পেলাম। ১২ ক্লাস পরীক্ষার পর ১৯৯৫ কলকাতা গোখেল রোড সিলেকশন সেন্টার থেকে সেনাবাহিনীর টেকনিকাল উইং-এ সেপাই পদে ভর্তি হন। ট্রেনিং-এর পরে রেডিও অ্যান্ড লাইন কম্যুনিকেশন-এর কাজ শুরু করেন। নিজের বিশেষ উৎসাহে ডিপ্লোমা পাশ করে এখন হাবিলদার মেজর হয়েছেন। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের পরে মাইনে এখন সব মিলিয়ে ১৯০০০ টাকা। বছরে তিন মাস ছুটি। বেশ সন্তুষ্ট এবং নিজের কাজে খুবই প্রত্যয়ী। আমাদের দুটো জায়গা দেখাবেন।

তাওয়াং থেকে ২৬ কিলোমিটার যাওয়ার পরে ওয়াই জংশন এল। উচ্চতা ১৫১০০ ফিট। এই জংশন থেকে ১৩ কিলোমিটার দুরে 'বুমলা' পোস্ট যা চীন সীমান্তে। আর ওখান থেকেই ১৩ কিলোমিটার দুরে সানগাতসের লেক। প্রথমে মিলিটারি পুলিশের চেক পোস্টে সব কাগজপত্র দেখিয়ে বুমলা রওনা হলাম। মাঝে একটি ব্যাটেলিয়নের সদর দফতরের সীমানার মধ্যে আবার পারমিট দেখিয়ে বুমলা-র পথে এগোলাম। এত বরফ চারদিকে যে মাঝেকার রাস্তা ছাড়া সবই সাদা। রাস্তার দু'পাশে জায়গায় জায়গায় বাঙ্কার বানানো আছে যা ওপর থেকে বোঝা যাবে না। আমাদের সেনাবাহিনীর সতর্ক প্রহরার নিশানা। শেষের ৩ কিলোমিটার এ কোন রাস্তা তৈরি হয়নি। কাঁচা সড়ক দিয়ে গাড়ি খানিকদূর এগোবার পর, শেষ ২ কিলোমিটার অনেক বেশি চড়াই আর লুজ

বোল্ডার-এর জন্য গাড়ি আর গেল না। অতএব দূর থেকেই চীন সীমান্তকে নমস্কার জানিয়ে ফেরত আসতে হল।

ওয়াই জংশন থেকে এবার সানগাতসের লেকে পৌঁছলাম। এই লেক ইদানীং বেশ বিখ্যাত হয়ে গিয়েছে, 'কয়লা' সিনেমায় মাধুরী দীক্ষিত-এর লোকেশন শুটিং-এর পর। চারদিকে উঁচু পাহাড়ের মাঝখানে টলটলে জলের এক সরোবর। ১৯৫০ সালে এক বিরাট ভূমিকমপে জমি ধসে গিয়ে এই লেক-এর সৃষ্টি। ভূমিকমপের আগে যে ফার গাছগুলো এই জায়গায় ছিল তারা জলে ডুবে যাওয়ায় মারা গেছে। শুধু তাদের কাণ্ডগুলো এখনও দাঁড়িয়ে আছে কমপ্লিট ডিকমপোজিশন (অর্থাৎ পুরো পচে যাওয়া)-র অপেক্ষায়। লেকের পাড়ে লাঞ্চ খাবার জন্য সেনাবাহিনীর তরফ থেকে 'কাফে' বানানো আছে। চা, কফি পাওয়া যায়। ওখানে বসে খাবার খেয়ে নেওয়া হল।

এবার ফেরার পালা। ১০০০০ ফিট এ তাওয়াং থেকে ১৬০০০ ফিট বুমলা - এই পথে অনেক জায়গায় ছোট বল লেক-এর দেখা মিলল। বরফ জমা জলে এই লেকের সৃষ্টি। ঠাণ্ডার সময় ওই সব লেক জমে সাদা ময়দান হয়ে যায়। তাওয়াং-এর তুষার-শীতল উচ্চতা আর এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিশ্বের অনেক বিখ্যাত পর্যটনস্থলকে হার মানায়।

এইখানে একটা সাবধানবাণী দিয়ে রাখি। বেশি উচ্চতায় অক্সিজেন কমে যায়। তাই ১০০০০ ফিট এর উপরে কোন জায়গাতেই গেলে অভ্যস্ত না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত খুব ধীরে ধীরে চলাফেরা করা উচিত। কারণ এতে ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাওয়া এবং পালমোনারি ইডিমা-র ভয় থাকে। তাওয়াং থেকে কিছু দূরে ১২০০০ ফিট উচ্চতায় এইজন্যে এক্লাইমেটাইজেশন শিবির আছে। হিমালয়ের উচ্চতর অঞ্চলে বোটিং এ যাওয়ার আগে ৭ দিনের ক্যামপে রাখা হয় এখানে। নিয়মিত এক্সারসাইজ করার পরে ডাক্তারি পরীক্ষায় যারা উতরে যান তাঁদেরই আরও ওপরে পাঠানো হয়। অন্যদের আরও সময় দেওয়া হয় নিজেকে মানিয়ে নেবার জন্য।

হিমালয়ের যে জায়গাগুলো আমরা ঘুরে এলাম, আমাদের সেনাবাহিনী তার থেকে অনেক দূরে এবং অনেক বেশি উচ্চতায় অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে দেশের সীমা রক্ষা করছে। তাদের অসংখ্য প্রণাম।

তাওয়াং-এ পর্যটকদের আসার জন্য গুয়াহাটি থেকে গাড়ি ভাড়া করেই আসাই ভালো। বাস অবশ্য আছে কিন্তু এত দীর্ঘ রাস্তায় বাস যাত্রা সহজ নয়। পর্যটকদের জন্য অনেক হোটেল আছে। তাওয়াং-এ প্রতি বছর প্রায় ১৬০০০ দেশি পর্যটক আসেন। বিদেশী সেই তুলনায় নগন্য। ২০০৪ এ মাত্র ২১৫ জন বিদেশী পর্যটক এসেছিলেন এখানে।

গুয়াহাটির থেকে ৫৫০ কিলোমিটার দূরে ২০৮৫ বর্গ কিলোমিটার পাহাড়ি এলাকা জুড়ে তাওয়াং জেলা। তাপমান ৯ ডিগ্রি থেকে ১ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করে। তাওয়াং এর পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভাগ ভুটান দিয়ে ঘেরা। মোনপা আদিবাসী এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা। সবাই বৌদ্ধধর্মাবিলম্বী। দলাই লামা যখন তিব্বত থেকে ১৯৫৯ সালে ভারতে আসেন তখন তাওয়াং-এই তাঁর প্রথম স্বাগত হয়।

এখানকার জমিতে চাষ-আবাদ বেশি হয় না। ভুট্টা এবং মিলেট একমাত্র কৃষি উপজ। তবে আলু, বাঁধাকপি, ফুলকপির ফলন হয়। এছাড়া আছে আপেল, কিবি, কমলালেবু এবং পেয়ারার বাগান। কিন্তু ফলের বাগান করবার জন্য অনেক জঙ্গলকে কাটতে হচ্ছে।

এবার একটু জঙ্গলের গল্প হোক। বমডিলা থেকে তাওয়াং এবং তাওয়াং থেকে বুমলা যাবার পথে উচ্চতার পরিবর্তন প্রায় ৪০০০ ফিট থেকে ১৬০০০ ফিট পর্যন্ত হয়। এর ফলে বনের গাছপালারও পরিবর্তন হতে থাকে। যেমন ৪০০০ ফিট উচ্চতা পর্যন্ত চীর পাইন দেখা যায়। তারপর চীর-এর জায়গায় ব্লু পাইন বা চোইল (পাইনাস ওয়ালিসিয়ানা) এসে যায়, যা চলতে থাকে দশ থেকে এগারো হাজার ফিট পর্যন্ত। এই দু'রকম পাইনের গাছ চেনার একটা সরল সুত্র আছে। পর্ণমোচী (কনিফার) গাছের পাতাগুলো পরিবর্তিত হয়ে লম্বা সূচের মতন হয়। চীর পাইনের নিডলগুলো তিন তিন-এর গুচ্ছে থাকে। আর ব্লু পাইনের গুচ্ছতে থাকে ৬টি করে নিডল। পাইনের কাঠে রেজিন থাকে যা দাহ্য বস্তু। পাহাড়ের পথে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম যাবার সময় অন্ধকার রাতে গ্রামের লোক পাইনের ডাল বা এক টুকরো কাঠ কেটে তার মাথায় আগুন জ্বেলে নেয়। সেই কাঠের টুকরোটা টর্চ লাইটের মতন কয়েকঘন্টা জ্বলতে পারে। যতক্ষণ না রেজিন ডাক্ট থেকে সমস্ত রেজিন কাঠের মাথায় পৌঁছে পুড়ে নি:শেষ হচ্ছে, ততক্ষণ আগুন নেভে না।

৪০০০ ফিট এর ওপরে ফার-এর জঙ্গল দেখা যায় এবং ১২-১৩০০০ ফিট পর্যন্ত ফার(অ্যাবিস ডেনসা) চলতে থাকে। এই গাছের কাঠ পাহাড়ি এলাকায় ঘরবাড়ি বানানোর কাজে লাগে। তবে এই পূর্ব হিমালয়ের ফার আর পশ্চিম হিমালয়ের ফার (অ্যাবিস পিণ্ডরো) দেখতে একরকম হলেও আসলে আলাদা আলাদা প্রজাতি।

৬০০০ ফিট এর ওপর থেকে ১৬০০০ ফিট পর্যন্ত যতদূর পাহাড়ে উঠলাম, রোডোডেনড্রন সাথে ছিল। পার্থক্য এই যে কম উচ্চতায় রোডোডেনড্রন মাঝারি সাইজের আয়তনের গাছ হয় কিন্তু উচ্চতার শেষ সীমায় এসে বরফের মধ্যে এর ছোট ছোট ঝোপ দেখা যায়। ১৪০০০ ফিট-এর ওপরে আলপাইন স্ক্রাব জঙ্গল হয়। এত উচ্চতায় শুধু রডোডেনড্রন এর ঝোপঝাড়, জুনিপার আর বার্চের ছোট ছোট ঝোপ বরফের ফাঁকে ফাঁকে জেগে থাকে। অভিজ্ঞ চোখ শুধু জঙ্গল দেখে সেই স্থানের উচ্চতার আন্দাজ করতে পারে।

বরফের দেশে গাছের মাথা টেবিলের ওপরটার মত চ্যাপ্টা গড়ণের হয়ে যায়। বছরের অধিকাংশ সময় গাছের মাথায় বরফ জমে থাকার ফলে তার লিডিং শুট ভেঙে যায় এবং শাখাগুলো পাশে ছড়িয়ে একটা টেবিলের টপের আকার ধারণ করে।

২৯/৪/০৩

তাওয়াং থেকে ২৯ এপ্রিল হেলিকপ্টারে করে গুয়াহাটি ফেরত এলাম। আগে প্ল্যান করা ছিল ত্রিশে এপ্রিল হেলিকপ্টার-এ গুয়াহাটি ফেরা হবে। কিন্তু শেষ মুহুর্তে জানা গেল মেরামতির জন্য হেলিকপ্টার সেদিন আসবে না। তখনই একটা অন্য প্ল্যান বানাতে হল। তাওয়াং থেকে ত্রিশ তারিখ সকালে রওনা হয়ে বিকাল তিনটে নাগাদ বমডিলায় এসে রাত্রিবাস। পরদিন সেখান থেকে রওনা হয়ে বিকাল চারটে নাগাদ গুয়াহাটি ফেরত আসা হবে। তবে পাহাড়ি পথে সাড়ে পাঁচ শো কিলোমিটার আবার যাত্রা করার মত শারীরিক সাহস জোটাতে আমাদের দুজনেরই চিন্তা হচ্ছিল।

কিন্তু সে কষ্টটা আর করতে হল না। ডি এফ ও মিস্টার গোগোই খবর নিয়ে এলেন যে ঊনত্রিশে এপ্রিল ইটানগর-এর হেলিকপ্টার তাওয়াং আসবে। উনি তৎক্ষণাৎ আমাদের দুটো আসন বুক করে দিলেন। তাই আমরা ঊনত্রিশ তারিখে সকাল এগারোটায় তাওয়াং থেকে রওনা দিয়ে দুপুর বারোটা নাগাদ গুয়াহাটি এয়ারপোর্ট পৌঁছে গেলাম।

গুয়াহাটিতে হৃদেশ মিশ্র এয়ারপোর্ট-এ রিসিভ করতে এসেছিলেন। গুয়াহাটিতে সার্কিট হাউজে থাকার ব্যবস্থা ছিল। বিকালে মা কামাখ্যার মন্দির দর্শন করে এলাম।

(শেষ হল সূর্য ওঠার রাজ্যে ভ্রমণের পালা। আগামি সংখ্যায় গাড়ি ছুটবে গুয়াহাটি ছেড়ে মেঘ আর ব্রাঞ্চ পাইনের বাড়ি শিলঙের পথে। এসো অপেক্ষায় থাকি)

বিদেশ ভ্রমণ

আবু হোসেন

দেশ ভ্রমণে আপত্তি নেই আমার
দেশ ভ্রমণে আপত্তি নেই মোটে
যেতেই পারি ইচ্ছে হলেই যাবার
মনের মত টিকেট যদি জোটে।

আদিম কালের লোহার রকেট গাড়ি
ভিনদেশে তো দিচ্ছে সে-ও পাড়ি
ইঞ্জিন তার বেশ পুরোন স্টাইল
ঘন্টায় যায় মাত্র ছ'লাখ মাইল

পৃথিবীটা ছাড়িয়ে গেলেই পরে
ঘুম পাড়িয়ে বাক্সবন্দি করে
ঢুকিয়ে দেয় ঠাণ্ডা বরফ ঘরে
কত দিন যে থাকতে হবে মরে!

জাগবে যখন লম্বা ঘুমের শেষে
পৌঁছে গেছো তখন নতুন দেশে
হারিয়ে গেছে অনেক বছর মাস
আকাশ জুড়ে জ্বলন্ত সিগনাস
দিচ্ছে আলো, ঠিক যেন এক হিরে
দশটা গ্রহ ঘুরছে তাকে ঘিরে-----

চাই না যেতে অমন রকেট চড়ে
ঘুরতে গিয়ে কে থাকতে চায় মরে!
আমি চড়বো মডার্ন আলোক যানে
বিজ্ঞাপনে দেখেছি কোন খানে
আলোর চেয়েও অধিক গতি তার
সাতটি দিনেই গ্যালাক্সি হয় পার।

সেই রকেটের টিকেট যদি মেলে
মনের মতো উইন্ডো সিট পেলে
পপকর্নের বাক্স নিয়ে হাতে
মহাকাশের গভীর আঁধার রাতে
লক্ষ তারার হরেক তারাবাজি
দেখতে দেখতে বিদেশ যেতে
রাজি , আমি রাজি ।

ছবি মৌসুমী

চোর ধরা

তাপস শংকর ব্রহ্মচারী

পরশু রাতে লোডশেডিংয়ে জ্বলছিল না আলো
পিসেমশাই চেঁচিয়ে ওঠেন, একটা কিছু জ্বালো--
অন্ধকারে সুযোগ বুঝে চোর ঢুকেছে ঘরে
আমায় দেখে পালাচ্ছিল, জাপটে আছি ধরে

নড়াচড়া বন্ধ ব্যাটার মুখ ধরেছি চেপে
গোঁ গোঁ আওয়াজ করছে শুধু উঠছে কেঁপে কেঁপে
আওয়াজ শুনে ঘুমের থেকে হুড়মুড়িয়ে উঠে
যে যে ছিল সবাই এল পিসের ঘরে ছুটে
কিছুই দেখা যাচ্ছে না তো লোডশেডিংয়ের জন্যে
দেশলাই বা একখানা টর্চ সবাই খুঁজে হন্যে
কে কে এলো ক'জন এলো যাচ্ছে না তো গোণা
চোরবাবাজির গোঙানিটাই যাচ্ছে শুধু শোনা

এমন সময় হঠাৎ করে উঠল জ্বলে আলো
পড়িমড়ি করে সবাই চোর দেখতে গ্যালো
আরে ছ্যা ছ্যা পিসেমশাই চোর ধরেছেন কাকে
পাকড়ে ধরে আছেন তিনি নিজের জ্যাঠাইমাকে
জলপিপাসায় বুড়োমানুষ চাদর মুড়ি দিয়ে
গিয়েছিলেন পিসের ঘরে ঘটি হাতে নিয়ে
অন্ধকারে হাত থেকে তাঁর ঘটি পড়ার শব্দ
লাফিয়ে উঠে পিসেমশাই চোরটি ধরে জব্দ।

ছবি: সোমা

আজব ভ্রমণ

শিবেন সাহা

ছড়া আর ছড়ানি খুব পাড়াবেড়ানি
যখন যেখানে খুশি সেইখানে যাওয়া--
পেলিং শিলং ঘুরে, বরপেটা রোড ধরে
অবশেষে এলো তারা রাজাভাতখাওয়া।

হাতি বাঘে বসে সেথা সাপলুডো খেলে
তোর্সায় জল খায় ছাতিতে তৃষ্ণা পেলে
জ্বালাতে সাঁঝের বাতি, ডিগবয়ে আঁতিপাঁতি
খুঁজে নুনমাটিঘাটে পলতেয় জল ঢালে।

কাজিরাঙা থেকে এল জোয়ান গণ্ডার
হলং-এর বাংলোতে রাখলো সেবার
জামাই ষষ্ঠী দিনে, মাসাইমারার কনে
জ্যামাইকা গিয়ে করে পিঁপড়ে আহার।

সুইমিং স্যুট পরে, দুইজনে হাত ধরে
ইছামতি ফেরিঘাটে একটু ছাড়িয়ে
এক লাফে প্লেনে চড়ে ক্যালিফোর্নিয়া ঘুরে
হিথরো পোর্টে গেল ঠোঙা হাতে দাঁড়িয়ে।

প্যারিসে ক্যাসিনো হেরে আফেল টাওয়ারে চড়ে
চুড়ো থেকে ঝাঁপ দেয় অতলান্ত জলে
নরওয়েতে জাল ফেলে 'মারমেড' তারে তুলে
শেকহ্যান্ড করে 'জয় কৃষ্ণ' বলে।

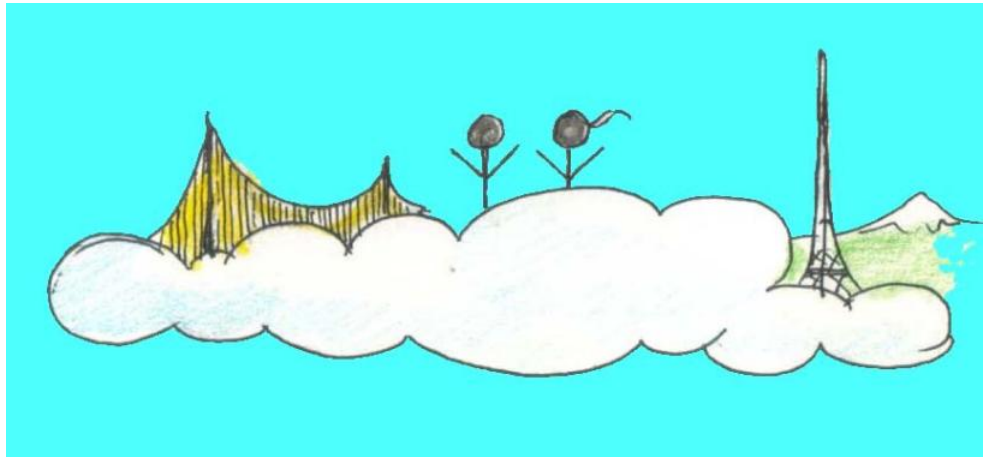

টুনটুনি

জামাল ভড়

ছোট্ট পাখি টুনটুনি
এমনতর ছটফটে
কেন দেখি বল শুনি!
ছোট্ট গাছে বসলে তুই
মনে হয় কি কাছে গিয়ে
তোকে একটু ছুঁই
ইতিউতি দেখিস কি রে!
বিড়ালছানা আসছে কিনা
দেখিস সেটাই ঘুরেফিরে?
ছোট্ট ছোট্ট পোকাগুলি
এ ডাল ও ডাল গিয়ে
গুণে গুণে ক'টা খেলি?
তুলতুলে তোর দেহখানি
আমার কাছে চিরকালই
ধরাছোঁয়ার বাইরে জানি।

ছবি: সোমা

অপরূপ

তাপস কুমার মুখোপাধ্যায়

ফুটফুটে ছেলেটার
টুকটুকে জামাটার
কি বাহার! কি বাহার!

নাম তার টুকটুক
দুধ খায় চুকচুক
কি বা সুখ! কি বা সুখ!

অপরূপ বিছানায়
শুয়ে থাকে জোছনায়
কি মজায়! কি মজায়!

ওমনিভোরাস হোমনিচরণ

শান্তনু

ওমনিভোরাস হোমনিচরণ গঙ্গাজলে বসে,
দেখতে পেলেন হাঙরছানা
যাচ্ছে ভেসে ভেসে
পিঠ পাখনা যেই উঠেছে জলের ওপর
জেগে
অমনি তখন হোমনিচরণ
খুব ধরেছেন চেপে
ঘন্টা আধেক লাগল মোটে
চরায় এনে রাখা
ভাজতে বাকি মিনিট কয়েক
দু-মিনিটেই সাফা

ছবি মৌসুমী

ইষ্টিকুটুম

জ্যোতির্ময় মল্লিক

ওপারেতে রোদ ঝুরঝুর এপার পড়ে বৃষ্টি,
মিষ্টি নিয়ে এলেন ঘরে নতুন কুটুম ইষ্টি।

কুটুম এলো কুটুম এলো সঙ্গে সাঁচি পান,
ধান সুপারি, পান সুপারি গাইল কতই গান।

সাঙ্গ হল গানের পালা ভোর হয়েছে যেই,
পুবের আকাশ ফর্সা হতে কুটুমতো আর নেই।

পিকনিক

হীরক সেন

পাখি আর পাখি
নাক ডোবা নাকি
সে বিলের চর
পাখিদের ঘর।

সারি ডাব গাছ
ঢেউ এ হাঁসে নাচ
শামুকের খোল
কিচিমিচি বোল।

সাদা, সোঁদা বালি
বাখারির চালি
ফুটো ফাটা নাও
ছোটো মাঝি গাঁও।

ভিজে পায়ে হাঁটা
লোনা জল চাটা
জাল, মাছ, বাঁশ
অন্য সুবাস।

টাপুরে টুপুরে
মেঘলা দুপুরে
আধ্‌খোলা ছাতা...
রাতে কলকাতা।

Michael Gajdeczka.

এইবারে ঠিক বানান লিখেছি। সেবার শান্তিনিকেতন যাওয়ার টিকিট কাটতে গিয়েই হয়েছিল বিপত্তিটা। মাইকের সারনেমের বানানটা লিখতে গিয়ে কী সমস্যা। শেষ পর্যন্ত একটা গাঁজাখুরি দিয়ে কিছু একটা লিখে দিয়েছিলাম। তাতে দেদার চটে ছিল ছেলেটা। এমনকি ট্রেনের গায়ে সাঁটা ভুল নামের ছবিটাও তুলে এনে দেখিয়েছিল। যাই হোক বেশ খারাপ লেগেছিল সেদিন। ভেবেছিলাম ফিরে এসে এই খটমট বানানের পদবির উৎস যে দেশটা সেটা সম্বন্ধে একটু জানবো।

মাইক সেকেণ্ড জেনারেশন আমেরিকান। ওর বাবা পোলিশ। ও নিজেকে পোল্যাণ্ডেরই মনে করে। তাই মাঝে মাঝেই ফিরে যায় পোল্যাণ্ডে নিজের দাদু-ঠাকুমার সাথে সময় কাটাতে। বেশ মিশুকে, লম্বা, চওড়া এই ছেলেটাকে প্রথমবার দেখেছিলাম গতবছর জুন মাসে। গবেষণার কাজে ইউনিভার্সিটি অফ ফ্লোরিডা থেকে কলকাতায় আসা এই ছেলেটাকে যে কেউ দেখলে স্পোর্টসম্যান বলে ভুল করবে। পরের সাত মাসে ওর সাথে পরিচয়টা বাড়ার সাথে সাথে ওর দেশ সম্বন্ধেও জানলাম বেশ কিছু কথা।

উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সমতল এই দেশটার কোনো প্রাকৃতিক সীমাও নেই সে অর্থে। তিনদিকের দেশগুলো হলো জার্মানি, চেক রিপাবলিক, স্লোভাকিয়া, ইউক্রেন, বেলারুশ এবং উত্তরে বাল্টিক সাগর। বেশ জনবহুল একটা দেশ। দেশের দক্ষিণে কারপাথিয়ান পর্বতমালা। দীর্ঘতম নদী ''ভিসচুলা'' এবং ''ওডের'' - দুটোই গিয়ে পড়েছে উত্তর বাল্টিক সাগরে। আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর মতই। নদী বিধৌত এই দেশে নদী পথেই ভাইকিংসদের অনুপ্রবেশ। এছাড়া দেশটায় আছে প্রচুর হ্রদ। এইসব হ্রদের দ্বীপে বহুকাল ধরে বাস করছে মানুষজন। মরুভূমি ব্লেডো দক্ষিণ অংশে অবস্থিত; এটা এই অক্ষাংশের উষ্ণতম মরুভূমি।

যাই হোক মাইকের কথায় ফিরে আসি। পোলিশ বাবা-মায়ের ভীষণ আদরের এই ছেলেটা কারুর বাড়ি গেলেই নিজের পরিবারকে ভীষণ মিস করে নিজের বাড়ির লোকজনের সাথে মিল খুঁজে ফেরার চেষ্টায়। এই জাতের লোকজন বেশ খাদ্যরসিক। সেটা অবশ্য মাইককে দেখলেই বোঝা যায়। ক্যান্টিনের টিফিনই হোক কিংবা নবমী পূজোর ভোজ, এ সি রেস্তোরাঁ হোক বা বৃষ্টিবহুল চটের প্যাণ্ডেলের নেমন্তন্ন, সবেতেই আমরা যা খেতাম মাইক খেত তার দ্বিগুণ। আর সঙ্গে সঙ্গে খাবারের ছবিও ক্যামেরাবন্দি করত।

এদের খাবার-দাবারে পূর্ব ইউরোপ আর জার্মানির প্রভাব আছে। রুশ, ইতালীয় আর তুর্কি স্বাদও মিশে আছে সব রেসিপিতে। তবে প্রত্যেক রান্নাতেই মাংসের প্রাচুর্য। মশলাপাতিও প্রচুর ব্যবহার হয় এদের রান্নায়। তাই হয়তো অ্যান্টিসেপ্টিক টিস্যু পেপারে হাত মুছে মাইক আমাদের খাবার খেত চেটেপুটে। হাজার হোক মশলার দেশ আমাদের।

তবে মাইক বেশ ভদ্র ছেলে। ওর সাথে বেড়াতে গেলে ভারী ব্যাগ নিয়ে হাঁটতেই দেবে না কোনো মেয়েকে। এটা নাকি ওদের দেশের নিয়ম। আমাদের এখানে মেয়েদের প্রতি এইরকম সম্মান দেখানো আজকাল তো প্রায় উঠেই গেছে, তাই বেশ অস্বস্তি হতো ব্যাপারটাতে। আসলে এই ভদ্রতাবোধের মূলে আছে ওদের সংস্কৃতির উৎস। যতটুকু জেনেছি তার নির্যাস হলো এই যে, সে সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে ল্যাটিন আর বাইজানটাইন সংস্কৃতির মিশেলে। হয়তো ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই।

আরেকটা জিনিস আমি মাইকের কাছে প্রথম শুনেছি; ''বিট বক্সিং''। মূলত: গলার স্বরে যেকোন আওয়াজকে নকল করার লোকশিল্প। বিভিন্ন লোকশিল্প পোল্যাণ্ডে নাকি বেশ জনপ্রিয়।

সুর, তাল, লয়, ছন্দ এগুলো বোধ হয় দেশ বা জাতির ব্যবধান কাটিয়ে দিব্যি ছড়িয়ে থাকতে পারে। সেই কারণেই বিট বক্সিং-এর তাল জ্ঞান সম্বল করে মিনিট পনেরতেই ঢাকের কাঠির বোল রপ্ত করে মাইক।

সামগ্রিকভাবে এদেশের মানুষজন ক্যাথলিক। কিন্তু বেশ সহিষ্ণু অন্য ধর্ম সম্বন্ধে, যা প্রাচীনকাল থেকেই প্রকৃত সুশিক্ষার সুফল। বর্তমানে শিক্ষাদীক্ষা বেশ ভালো অবস্থায়। প্রচুর গবেষণার কাজকর্ম হয়। কোপারনিকাস থেকে মেরি ক্যুরি সকলেই এখানকার লোক।

সবশেষে এখানকার জীব বৈচিত্র্য সম্বন্ধে একটু জানিয়ে রাখি। প্রথমেই বলি পোল্যাণ্ড হলো ইউরোপে যাওয়া পরিযায়ী পাখিদের প্রজনন স্থল এবং এর মুখ্য কারণ হলো এখানকার লেকগুলো। দেশের তিরিশ শতাংশ জঙ্গলে ঢাকা। বাকি এলাকায় চাষবাস হয় ভালোই। বেশ কিছু বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী যাদের ইউরোপের অন্য কোথাও দেখা যায় না, তাদের দেখা মেলে এখানে - যেমন গ্রে উল্ফ, ব্রাউন বিয়ার, মুস ইত্যাদি।

এদের জাতীয় স্মারকটাও অদ্ভুত। একটা ঈগল। মুকুট পরা, ডানা মেলা; যেন প্রহরী। প্রায় হাজার বছর ধরে ব্যবহার হচ্ছে স্মারকটা। সময়ের সাথে সাথে ঈগলেরও সাজ পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সে রয়ে গেছে একই। অক্লান্ত প্রহরায়।

ধন্যবাদ মাইক, তোমার সুবাদে এমন একটা দেশকে জানলাম।

কিছু তথ্যঃ

ইতিহাসঃ ১০৪৭ সালে রাজা প্রথম কাসিমির, গ্রেট ও লিটল পোল্যান্ডকে জুড়ে বর্তমান পোল্যাণ্ডের জন্ম দেন। ১৭৭২, ১৭৯২ ও ১৭৯৫ তে রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া বারংবার দেশটাকে টুকরো করে করে নিজেদের দখলে নেয় ও তারপর প্রায় এক শতাব্দির বেশি সময় ধরে পোল্যাণ্ড দেশটার কোন অস্তিত্ব ছিলনা। ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে, বহু সংগ্রামের পর স্বাধীন , আধুনিক পোল্যাণ্ড জন্ম নেয়। তার ২১ বছরের মাথায়, ১৯৩৯ সালে আক্রমণ শুরু করে ১৯৪১ সালে গোটা পোল্যান্ডের দখল নিয়ে নেয় জার্মানি। তারা পোল্যাণ্ডের বিপুল ইহুদি জনতাকে নির্বিচারে হত্যা করেছিলো। এই সময় ফ্রান্স থেকে পোল্যাণ্ডের গভর্নমেন্ট ইন এক্সাইল বা নির্বাসিত সরকার তার কাজকর্ম চালাত। ১৯৪৪ সালে দেশটা ফের স্বাধীন হয়।

দেশের নাম: Rzeczpospolita Polska

আয়তন: ৩১২৬৮৫ বর্গ কিমি।

গড় আয়ু: সাড়ে পঁচাত্তর বছর।

কারেন্সি: zloty.

প্রধানমন্ত্রী: ডোনাল্ড টাস্ক

জনসংখ্যা: ৩৮৪৮২৯১৯

রাজধানী ও বৃহত্তম নগরী: ওয়ারশ।

প্রধান নদী: ওডের, নিয়েস, ভিসচুলা, ওয়ারটা ও বুগ।

বিচিত্র দুনিয়া

লেমিং কি সত্যিই আত্মঘাতী?

সমপ্রতি টি ভি তে একটি মোবাইল পরিষেবা সংস্থার বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে যে, ঝাঁকে ঝাঁকে ইঁদুর পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপ দিচ্ছে। এই ইঁদুরদের নাম লেমিং। লেমিং কি সত্যিই আত্মঘাতী!!

অরিন্দম দেবনাথের প্রতিবেদন—

নেংটি ইঁদুরের থেকে সামান্য বড়, তিন থেকে পাঁচ ইঞ্চির মত লম্বা, ছোট্ট লেজ, ওজন ৩০ থেকে ১১০গ্রামের মত। গা ভর্তি পুরু লোম, ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে রং পরিবর্তনে সক্ষম। মেরুবৃত্তের বাসিন্দা, ঘাস, গাছের মূল, কন্দ খেয়ে বেঁচে থাকা ছোট্ট প্রাণী হল লেমিং। একদম ইঁদুর গোত্রের প্রাণী। কানাডা, নরওয়ে, গ্রিনল্যান্ড এবং রাশিয়া, এই কতিপয় দেশের মেরুবৃত্ত ঘেঁষা অঞ্চল হল এদের চারণভূমি। গরমকালে লেমিংএর পুরু লোমের রং থাকে বাদামি ও ধূসর এর সংমিশ্রণ। মেরুবৃত্তের বরফ গলে যেতে, তার পাথর মাটি বরফের আস্তরণ থেকে বেরিয়ে যে ধূসর বাদামি রং মেলে ধরে ঠিক সেই রং। নাক হয়ে ওঠে কালো। কিন্তু যেই না বরফ পড়া শুরু হয়, ধূসর-বাদামি লেমিং এর লোমের রং বদলে হয়ে যায় সাদা, এমনকি নাকের ডগাটাও হয়ে ওঠে সাদা। বরফের মাঝে এই ইঁদুরের দলকে তখন খুঁজে পাওয়া হয়ে ওঠে দুষ্কর।

মেরুবৃত্তের সব চাইতে ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী হল লেমিং, এবং মেরুবৃত্তের খাদ্য শৃংখলে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা লেমিংএর। মেরু শেয়াল, তুষার প্যাঁচা, বাজপাখি, এদের প্রধান খাদ্যই হল লেমিং। সব চাইতে অবাক করা কান্ড হল লেমিং-এর বংশ বিস্তারের দ্রুততা। লক্ষ লক্ষ লেমিং ঘুরে বেড়ায় মেরুবৃত্ত জুড়ে। কিন্তু দেখা গেছে, প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর লেমিংএর সংখ্যা নেমে আসে প্রায় বিলুপ্তির পর্যায়ে। তারপর আবার এক ধাক্কায় লেমিংএর বংশ বিস্তৃতি হতে থাকে দ্রুত। আচমকা অবলুপ্তির পথে চলে যাওয়া ও তার পর রহস্যময় এই দ্রুত বংশ বিস্তারের মাধ্যমে লেমিংরা মেরু বৃত্তের প্রাণী শৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণ করে।

লেমিং মাটি খুঁড়ে (থুড়ি বরফ খুঁড়ে) বাসা বানায়। যেহেতু মেরুবৃত্তের মাটি সব সময় শক্ত হয়ে থাকে তাই লেমিংরা চেষ্টা করে তুষার ঘেঁষা অঞ্চলেই বেশি থাকতে, যাতে করে বরফ খুঁড়ে বাসা বানানোটা সহজ হয়। বরফের গর্তের ভেতরে এরা শুকনো ঘাস, লতাপাতা জড়ো করে সেটাকে আরামদায়ক করে তোলে।

লেমিং সাধারণত দু রকমের হয়-- বাদামি ও রঙিন লেমিং। এরা পছন্দ করে বেশি উচ্চতার অপেক্ষাকৃত শুকনো অঞ্চল, কিন্তু শীতকালে সব প্রজাতির লেমিং চলে আসে নীচু অঞ্চলে, যেখানে তুষার জমার পরিমাণ খুব বেশি। এই নেমে আসা মূলত বাসা তৈরির তাগিদে।

কারণ মাটির কাছাকাছি উষ্ণতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে।

শীত যত এগিয়ে আসতে থাকে, লেমিং এর শরীরের লোম ততই পুরু হতে থাকে। শীতে জমে লেমিং এর মৃত্যু হয় না, বরং বরফ এদের শরীরে তাপ ধরে রাখতে সাহায্য করে। শীতকালে লেমিং বাসার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে। তখন এদের খাদ্যেরও প্রয়োজন হয় না।

অনেক অনেক প্রাণীর মত লেমিংও সাধারণ মানুষের কাছে এমন কিছু বিশেষত্ব দাবী করত না যদি না ওয়াল্ট ডিজনির কোমপানির ১৯৫৮ সালে টেলিভিশনের জন্য তৈরি তথ্যচিত্র ''হোয়াইট ওয়াইলডারনেস'' ছবিতে দেখা যেত, ঝাঁকে ঝাঁকে ইঁদুরের দল পাহাড়ের মাথা থেকে ঝাঁপ দিচ্ছে সমুদ্রের জলে । সারা বিশ্ব চমকে উঠেছিল পৃথিবী খ্যাত সিনেমা কোমপানির তৈরি এই তথ্যচিত্র দেখে। আত্মঘাতী ইঁদুরের দল! জীববিজ্ঞানীরা শুরু করলেন অনুসন্ধান। অনেকেই বিশ্বাস করতেন যে , লেমিংরা দু-তিন বছর পর পর ঝাঁকে ঝাঁকে পাহাড়ের থেকে ঝাঁপ দেয় সমুদ্রের উদ্দেশ্যে, তারপর মারা যায় জলে ডুবে বা উপর থেকে পাথরের ওপর আছড়ে পড়ে। ডিজনি কর্পোরেশানের তৈরি এই তথ্যচিত্র দেখার পরে অনেকের মনে দৃঢ় ধারণা হল, যে লেমিং হল আত্মঘাতী প্রজাতির প্রাণী। দলে দলে এরা সারিবদ্ধ ভাবে এগোতে থাকে এবং তারপর আত্মঘাতী হতে ঝাঁপ দেয় দলে দলে পাহাড়ের মাথা থেকে। এমনকি অবিবেচক ভাবে কেউ কাউকে অনুসরণ করলে লোকে বলতে শুরু করল 'লেমিং লাইক'।

ইঁদুর প্রজাতির কিছু প্রাণীর বৈশিষ্টই হল আচমকা বংশবৃদ্ধি। এই বংশবৃদ্ধি কখনও কখনও পৌঁছে গেছে ইঁদুরের জন বিস্ফোরণে। এরকমই একবার হয়েছিল আমেরিকার সেন্ট্রাল ভ্যালি অফ

ক্যালিফোর্নিয়ায়। ১৯২৬-২৭ সালে ইঁদুরের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রতি হেক্টারে প্রায় দু লক্ষ। অর্থাৎ প্রতি বর্গ মিটারে প্রায় ২০টি। ফ্রান্সে ১৭৯০ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে অন্তত ২০ বার প্লেগ-এর মহামারী হয়েছিল ইদুরের জন-বিস্ফোরণের কল্যানে। হাজারে হাজারে মানুষ মারা গেছিল তাতে।

সাধারণ ইঁদুরের সাথে লেমিং এর পার্থক্য হল, ইঁদুরের জন বিস্ফোরণ কবে ঘটবে বলা যায় না। কিন্তু লেমিং-এর ক্ষেত্রে সেটা নির্দিষ্ট। এদের সংখ্যার বাড়-বাড়ন্ত হয় প্রায় প্রতি চার বছর অন্তর। আর এই চূড়ান্ত বংশ বৃদ্ধির পরেই আকস্মিক ভাবে লেমিং এর সংখ্যাটা নেমে যায় প্রায় বিলুপ্তির কাছাকাছি, এবং তারপর আবার এই সংখ্যাটা বাড়তে থাকে। বিশেষজ্ঞরা এখনও বলতে পারেননি কেন এমন ঘটে, তবে অনেকগুলো কারণ এর পেছনে কাজ করে বলে অনুমান করা হয়। যেমন খাদ্যের অপ্রতুলতা, আবহাওয়ার পরিবর্তন, সংক্রমণজনিত রোগ, তুষার জমা এবং গলার পরিমাণ ইত্যাদি। গ্রীষ্মে তুষার গলে গেলে জলের স্রোতে ভেসে মারা যায় অনেক লেমিং। এমনকি এই সময় মেরু বৃত্তের অন্যান্য লেমিংভূক প্রাণীরা, লেমিংদের তুষার বাসা ভেঙে যাওয়ায় সহজেই লেমিং শিকার করে খেয়ে ফেলে।

আর, যখনই লেমিংদের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে যায় তখন ঝাঁকে ঝাঁকে লেমিং শুরু করে এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় যেতে। মূলত নতুন বাসস্থান অথবা খাদ্যসন্ধানে সারিবদ্ধ ভাবে হাজারে হাজারে লেমিংএর দল এগোতে থাকে পিপঁড়ের সারির মত লাইন দিয়ে। কোন্ দিকে যাচ্ছে সেটা না বুঝেই এরা এগোতে থাকে ঝোরার জল টপকে, নদীর জলে সাঁতার কেটে এমনকি খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে। তারপর, পাহাড় শেষ হয়ে গেলে ঝাঁপ দেয় সোজা মেরু সমুদ্রে। জলে ডুবে মারা যায় লক্ষ লক্ষ লেমিং। ডিজনি কর্পোরেশনের হোয়াইট ওয়াইল্ডারনেস ছবিতে এটাই দেখিয়েছিলেন ফোটোগ্রাফারেরা। কিন্তু ওই ছবিতে লেমিংদের পরিযায়ী হবার বিষয়টা একটু ভূল ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

১৯৮১ সালে একটি ফরাসি তথ্যচিত্রে, লেমিংরা যে আত্মঘাতী নয় তা পরিষ্কার করে দেখান হয় এবং বিশ্লেষণ করা হয়। এবং ডিজনি কর্পোরেশানকে অনুরোধ করা হয় তাদের তৈরি পূর্বতন তথ্যচিত্রে এই ভূল সংশোধন করার জন্য। দলে দলে লেমিং পাহাড় থেকে সমুদ্রের জলে আছড়ে পড়ে মারা যায় তাদের অবিবেচকের মত পরিযায়ী হবার পথে। হতে পারে প্রকৃতি এভাবেই লেমিংদের তৈরি করেছে তাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য। কিন্তু তাই বলে এটা কখনই ঠিক নয় যে তারা শখ করে আত্মঘাতী হতে চায়।

ফরাসি তথ্যচিত্রটি দেখানোর এক সপ্তাহের মধ্যেই ইউরো ডিজনির চিফ্ এক্সিকিউটিভ ড: ওয়াটল্ড ফ্রেড বহু কোটি টাকার একটি ‘লেমিং স্টাডি এন্ড রিসার্চ সেন্টার এন্ড স্যাংচুয়্যারি তৈরির কথা ঘোষণা করেন। হল্যান্ড এর মার্সট্রিক্টএ তৈরি হয় এই স্যাংচুয়্যারি।

আমাদের দেশেও একটি জায়গা আছে, যেখানে বিশেষ সময়ে রাত্রে আগুন জ্বালালে পাখিরা এসে সেই আগুনে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করে। কেন পাখির দল ওই বিশেষ সময়ে এবং বিশেষ আবহাওয়ায় ওই বিশেষ স্থানে
এসে আগুন দেখলেই তাতে সম্মোহিতের মত ঝাঁপ দেয় তা আজও জানা যায়নি । ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ওই বিশেষ জায়গাটির নাম জাটিঙ্গা।

উপসংহার

বেটেলগুয়েজ গ্রহপুঞ্জের সপ্তম গ্রহ থেকে প্রকাশিত কিশোর পত্রিকা 'কসমিকঢাক'-এর একটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি:--

সূর্য নামের একটি নক্ষত্র আছে। তার তৃতীয় গ্রহটিতে বসবাসকারী প্রাণী 'মানুষ'-এর বিচিত্র ব্যবহার আমাদের বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এরা সাংঘাতিক আত্মঘাতী জীব। ম াঝেমাঝেই 'যুদ্ধ' নামের একটা খেলা খেলে লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করে। বর্তমানে এই 'মানুষ' জীবরা, গোটা গ্রহের সব গাছপালা কেটে ফেলে বাতাসে ধোঁয়ার বিষ মিশিয়ে, নানা যন্ত্র পাতি ব্যবহার করে গ্রহটির তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়িয়ে গ্রহের সমস্ত মানুষের একসঙ্গে আত্মহত্যার আয়োজন করছে। গোটা গ্রহের ম ানুষ জীবেরা স্বেচ্ছায় এবং মহা উৎসাহে এই আত্মহত্যার আয়োজনে যোগ দিয়েছে। আমাদের বিজ্ঞানীরা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন। প্রকৃতির এই বিচিত্র ধাঁধার কোন ব্যাখ্যা এখনও অবধি পাওয়া যায়নি।

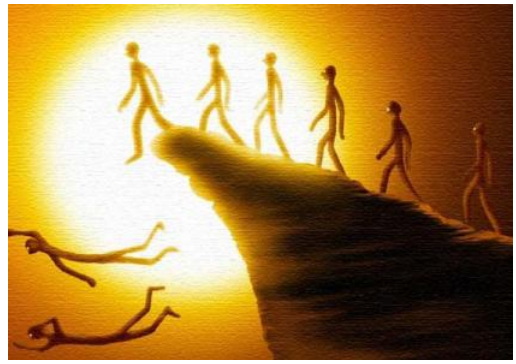

অগস্ত্যমালাই বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ

পশ্চিমঘাট পাহাড়ের একবারে দক্ষিণ প্রান্তে আছে অগস্ত্যমালাই। তামিলে মালাই মানে পাহাড়। মনে করা হয় যে শৈব মুনি অগস্ত্য পশ্চিমঘাট পর্বতের এই চূড়ায় থাকতেন এবং ভেষজ গবেষণা করতেন। তাই এই পাহাড়টাকে অগস্ত্যমালাই নামে ডাকা হয়।

অগস্ত্যমালাই বিভিন্ন কারণে পরিবেশবিদদের নজর কেড়েছে। প্রথমত, এখানে ২০০০ প্রজাতির ভেষজ মানে যে গাছ থেকে ওষুধ বানানো যায় তা পাওয়া যায়,তার মধ্যে পঞ্চাশটা বিরল প্রজাতির। দ্বিতীয়ত, সারা পৃথিবীর মধ্যে শুধু এখানেই পাওয়া যায় এমন জন্তু হলো ছাগল জাতীয় নীলগিরি তাড় এবং সিংহের মতো কেশরওয়ালা লায়ন-টেল বাঁদর। তৃতীয়ত, পৃথিবীর আদিমতম উপজাতিগুলোর মধ্যে অন্যতম একটা উপজাতি , ''কান্নিকরণ''রা এখানে বাস করে, এযাবৎ যারা চাষও করতে শেখে নি।

সাড়ে তিন হাজার বর্গ কিলোমিটার জায়গা নিয়ে ২০০১ সালে অগস্ত্যমালাই পাহাড়ে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ তৈরি হয়। এর মধ্যে ১৮২৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকা আছে কেরালার তিন জেলা থিরুভনন্তপুরম, কোল্লাম এবং পথনমথিত্তু জেলায় এবং বাকি ১৬৭২ বর্গ কিলোমিটার বন তামিলনাড়ুর দুই জেলা থিরুনালভেল্লী এবং কন্যাকুমারীতে।

বন এখানে মূলত: তিন ধরনের। যেখানে বছরের অধিকাংশ সময় বৃষ্টি খুবই কম পড়ে, যেমন এই পাহাড়ের পূর্ব ঢালে, শাল, পিটালি, শিমূল, জারুল-এর মতো আর্দ্র পর্ণমোচী গাছ জন্মায়। সাধারণভাবে এই অঞ্চলের উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে ১০০০ মিটারের মধ্যে হয়। পাহাড়ের পশ্চিমঢালে ১০০০ মিটার থেকে শুরু করে প্রায় ১৬০০ মিটার উঁচু অবধি অধিকাংশ এলাকায় বৃষ্টি খুব বেশি পড়ে এবং ছাতিম, নাগেশ্বর, ইত্যাদির সাথে বুনো প্রজাতির আম, কাঁঠাল, এলাচ, তেঁতুল, কলাগাছ ইত্যাদি চিরহরিৎ গাছের বন দেখতে পাওয়া যায়। ১৬০০ মিটারেরও বেশি উঁচুতে পাওয়া যায় শুধু শোলা বা চিরহরিৎ ঘাসের বন।

বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ তৈরির মূল উদ্দেশ্য যেহেতু বন্যপ্রাণ মানে বুনো গাছপালা এবং বুনো জন্তুদের আরও অনেক দিন বেঁচে থাকতে সাহায্য করা সেহেতু অগস্ত্যমালাই বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভকে অন্য সব বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের মতই তিনটে এলাকায় আলাদা করে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে যে সমস্ত এলাকায় মানুষের আনাগোণা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তাকে বলে

''কোর এলাকা''। অগস্ত্যমালাই বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের ''কোর এলাকা''-র ৩৫২ বর্গ কিলোমিটার কেরালাতে; এবং ৬৯১ বর্গ কিলোমিটার তামিলনাড়ুতে। কিছু এলাকায় জঙ্গলের গাছপালার কিছু কিছু বদল করতে লাগে বনের জন্তু এবং অন্য গাছেদের বাঁচার সুবিধা করে দেওয়ার জন্য; সেই এলাকাগুলোকে বলে ''বাফার এলাকা''। অগস্ত্যমালাই বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের ''বাফার এলাকা''-র ৬৯১ বর্গ কিলোমিটার কেরালাতে; এবং ১৯৮ বর্গ কিলোমিটার তামিলনাড়ুতে। বাফার এলাকার যে সব অংশে মানুষের সংখ্যা বেশি, সেই জায়গাগুলোতে বন বাড়াবার জন্য তাদের আলাদা নাম দেওয়া হয়েছে ''ট্রানজিশন জোন''। অগস্ত্যমালাই বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের ''ট্রানজিশন এলাকা''-র ১৮২৮ বর্গ কিলোমিটার কেরালাতে; এবং ১৬৭২ বর্গ কিলোমিটার তামিলনাড়ুতে।

এই এলাকা ''বিশ্ব হেরিটেজ ভূমি''-র তকমা পাবে কিনা সে বিষয়টা এখনও ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক এণ্ড কালচারাল এসোসিয়েশন বা ইউনেসকোর বিশ্ব হেরিটেজ কমিটির বিবেচনাধীন। কেরালার পেপ্পারা, নেয়্যার, শেন্দুরনে ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়রি এবং তার লাগোয়া আচেনকোয়াল, থেনমালা, কোন্নি, পুনালুর, থিরুভান্তপুরম বনবিভাগ ও অগস্ত্যমালাই বিশেষ বনবিভাগ অগস্ত্যমালাই বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের মধ্যে আছে। তেমনই তামিলনাড়ুর কালাক্কাড় মুণ্ডনথেরাই টাইগার রিজার্ভও অগস্ত্যমালাই বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের মধ্যে আছে। এর পর আমরা এইসব এলাকার কথায় আসবো।

(সঙ্গের ছবিটি হল অগস্ত্যমালাই বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের পশ্চিমপ্রান্তের পুনালুর এলাকার)

বনের ডায়েরি

কুয়োয় প্যান্থার

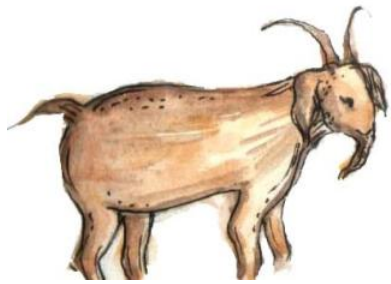

জে দত্ত

১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কথা। চিফ ওয়াইল্ড-লাইফ ওয়ার্ডেন হয়ে তখন সবে ভোপাল শহরে ফিরেছি। নতুন অফিসে বসে কাজ করছি একদিন, এমন সময় ছিন্দওয়ারা জেলার সিওনি থেকে ডি এফ ও সাহেবের ফোন এলো। বনে অঘটন ঘটেছে একটা। একটা প্যান্থার কুয়োয় পড়ে গেছে।

ঘটনাটা যা শোনা গেল তা মোটামুটি এইরকম। সিওনি থেকে ষোল কিলোমিটার দূরে একটা গ্রামে কুয়ো খোঁড়া হচ্ছিল। বেশ বড়সড়ো কুয়ো। পঁয়তাল্লিশ ফিট পরিধির গর্তটা তখন প্রায় পঁচিশ ফিট গভীরতা পর্যন্ত খোঁড়া হয়ে গিয়েছে। গর্তের চারপাশে খুঁড়ে তোলা মাটি ঢিপি করে রাখা। সম্ভবত রাতের বেলা শিকার ধরতে গিয়ে প্যান্থারটা দৌড়ে ওই মাটির ঢিপির ওপর চড়ে গিয়েছিল, আর তারপর ছোটার ঝোঁকে ভারসাম্য রাখতে না পেরে সটান গর্তের ভেতর গিয়ে পড়েছে।

সকালবেলা কুয়ো খুঁড়তে এসে খুঁড়িয়েরা দ্যাখে কুয়োর ভেতর বাঘ। দেখেই তারা দল বেঁধে গিয়ে ফরেস্ট গার্ডকে খবর দিয়েছে। এই ফরেস্ট গার্ডটি ছিল খুব বুদ্ধিমান। হিংস্র মানুষের দলের হাতে গর্তে আটক বন্যজীবের কী পরিণতি হতে পারে সেটা আন্দাজ করে প্রথমেই সে প্রত্যক্ষদর্শী লোক ক'টিকে সাবধান করে দিল যেন তারা বাইরের কাউকে কিছু না বলে। তারপর নিজে রেঞ্জারকে ফোনে খবরটা দিল। রেঞ্জার খবর দিল ডি এফ ও কে। তার থেকে আমার কাছে খবর এলো।

কুয়োর ভেতর থেকে বাঘ বের করতে হলে তাকে ঘুম পাড়ানো বা ট্রাংকুলাইজ করা ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই। ঘুমপাড়াণি গুলি ছোঁড়ায় বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। সৌভাগ্যক্রমে আমার সে অভিজ্ঞতা ছিল। ১৯৬৬ সালে কানাডায় ছ'মাসের এক ট্রেনিং নিতে পাঠান হয়েছিলো

আমাকে। তার সিলেবাস ছিল মেরুভল্লুক ট্র্যাকিং, মার্কিং, ট্রাকুলাইজেশান ও হেলিকপটার ট্রান্সপোর্টেশান, অর্থাৎ চিরতুষারের রাজ্যে মেরুভল্লুককে অনুসরণ করে চিহ্নিত করে তারপর তাকে ঘুম পাড়িয়ে হেলিকপটারে চাপিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া। তাতে আমি ও চার্লস জংকেল (মন্টানা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারমশাই। পরে ভল্লুক গবেষণা সংস্থার ডিরেক্টর হয়েছিলেন) মিলে প্রথমবারের জন্য মেরুভল্লুকের সফল ট্রাংকুলাইজেশান করি। এর আগে এই তুষারক্ষেত্রবাসী জীবটিকে ঘুমপাড়াণি গুলি ছুঁড়ে বশ করবার প্রতিটি চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল। গুলি খাবার পর প্রাণীটা একেবারে চির-ঘুমে ঢলে পড়তো। ঘুমপাড়াণি ওষুধের সঠিক ডোজ বুঝতে না পারার জন্যই এমনটা হতো। মেরুভল্লুক ছাড়াও সে যাত্রায় ক্যারিব্যু এবং বন্য মহিষও ট্র্যাংকুলাইজ করেছিলাম।

এইবারে, এগারো বছর পরে ভারতের প্যান্থারের ওপর আর একবার সেই প্রশিক্ষণ কাজে লাগাতে হবে। তবে মুশকিল হল, সে সময় অবধি দু একটা চিড়িয়াখানা ছাড়া ভারতবর্ষে ফ্রি রেঞ্জিং অ্যানিম্যালস্ বা মুক্ত বন্যপ্রাণীকে কখনো ট্র্যাংকুলাইজ করা হয়নি। ফলে আমার দফতরে ট্র্যাংকুলাইজেশনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কিছু ছিল না। অতএব কানাডার সেই মেরুভালুক ঘুম পাড়াবার সফল পরীক্ষার পর সে দেশ থেকে উপহার পাওয়া ঘুম পাড়াণি বন্দুকটাকে এত বছর পরে ফের বের করতে হল। ঘুমপাড়াণি ওষুধের একটাই শিশি অবশিষ্ট ছিল। সেই ওষুধের শিশি আর বন্দুক নিয়ে বের হয়ে পড়লাম সিওনির পথে।

সারারাত ড্রাইভ করে পরদিন সকালে সিওনিতে গিয়ে পৌঁছোন গেলো। গিয়ে দেখি একটা ভালো ব্যাপার ঘটেছে। সেইদিনই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এসেছেন সিওনিতে। জনতার ঢল নেমেছে তাঁকে দেখবার জন্য। ফলে একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে কুয়োর বাঘ দেখতে জনতার ঢল নামবে না। নিশ্চিন্তে কাজটা করা যাবে। ততক্ষণে কানহা থেকে পাওয়ার সাহেব, হাসান সাহেব ও চন্দ্রন এসে পৌঁছে গেছেন। সবাই মিলে চললাম অকুস্থল দর্শনে।

স্পটে পৌঁছে দেখলাম, সেখানে একলা একজন ফরেস্ট গার্ড পাহারা দিচ্ছে শুধু। তা ছাড়া গোটা এলাকা শুনশান। গার্ড ইতিমধ্যে করছে কি, প্যান্থারের খিদে পাবে ভেবে তার প্রাতরাশের জন্য একটা ছাগল আর একটা মুরগি দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে নামিয়ে দিয়েছে কুয়োর ভেতরে।

কুয়োর ভেতর উঁকি মেরে দেখি, সেখানে বেশ বিচিত্র পরিস্থিতি। প্যান্থার বেচারার খিদে ম রে গেছে বোধ হয়। ছাগল বা মুরগি কাউকেই সে ছোঁয়নি। তিনজন মিলে কুয়োর ভেতর দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে আর একে অন্যের দিকে সন্দেহজনক দৃষ্টিপাত করছে।

প্যান্থারটার ওজন আন্দাজ করে নিয়ে সেই অনুযায়ী ডোজ হিসেব করে ঘুমপাড়াণি গুলি তৈরি করে ফায়ার করলাম। প্রথমটা তার গায়ে লাগলো না। দ্বিতীয়বারের চেষ্টা সফল হল। বুলেটের তীক্ষ্ণ মাথাটা গিয়ে গেঁথে গেল প্যান্থারের পেশিতে।

এইবারে, তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষার পালা। খানিক বাদে দেখি তার ঘাড় ঝুলতে শুরু করেছে। একটুক্ষণের মধ্যেই সেই বসে থাকা ভঙ্গীতেই একেবারে থেমে গেল সে। তবে চোখদুটো খোলা। ওষুধটা আসলে একটা পেশি শিথিলকারী রাসায়নিক। ফলে তার ক্রিয়ায় প্যান্থারের শরীর অবশ হলেও অজ্ঞান সে হবে না। তাছাড়া, ওষুধের পরিমাণ বেশি হলে প্রাণীটা ম ারা যেতে পারে এই ভয়ে যতটা কম স ২ ব ডোজ ঠিক করেছিলাম। কাজেই শরীরের অবশ ভাবটাও থাকবে বড়জোর মিনিটদশেক। তার মধ্যে যা করবার করে ফেলতে হবে।

হাসান কিংবা চন্দ্রন কেউ দেখি কুয়োর ভেতর নামতে রাজি নয়। ওদিকে হাতের দশ মিনিট সময় থেকে মূল্যবান এক এক মিনিট সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর দেরি করলে গোটা চেষ্টাটাই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। শেষমেষ একরকম বাধ্য হয়েই একটা মই লাগিয়ে আমি নিজেই নেমে গেলাম কুয়োর মধ্যে।

তলায় নেমে বাঘের গায়ে ঢিল ছুঁড়লাম গোটাকয়। কোন সাড়া নেই। তারপর কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে দেখলাম দূর থেকে। তাতেও সে নট নড়ণচড়ণ। শুধু প্যাঁট প্যাঁট করে তাকিয়ে দ্যাখে আমার দিকে। তখন সাহস করে তার কাছে গিয়ে চট করে একটা দড়ির মাজল (muzzle) শক্ত করে বেঁধে দিলাম তার মুখে । এইবারে বাঘবাবাজি কাবু। দাঁত বাগিয়ে কামড়ে দেবার রাস্তা নেই তার। তখন সাহস পেয়ে বাকি সবাই কুয়োর মধ্যে নেমে দড়িদড়া দিয়ে বেঁধে বাঘ তুলল ওপরে।

মাটিতে শুইয়ে তার মাপজোক নেয়া হল। সমপূর্ণ সুস্থ সবল বাঘ। দাঁত, নখ সবকিছুই একেবারে স্বাভাবিক। অতএব তাকে আটকে রাখবার কোনও কারণ ছিল না। ঠিক করা হল সেখানেই তাকে মুক্তি দেয়া হবে জঙ্গলে।

মিনিট পনেরো ড্রাইভ করে যাবার পর উপযুক্ত জঙ্গলের দেখা পাওয়া গেল। ততক্ষণে গাড়ির পেছনে দড়িদড়া বাঁধা প্যান্থার নড়তে শুরু করে দিয়েছ। গাড়ি থামিয়ে তাকে যেই না নামিয়ে আনা, ওমনি দেখি সে টপ করে উঠে দাঁড়িয়েছে।

মুখের মাজলে আটকানো দড়ি হাতে ধরে তাকে নিয়ে ধীরে ধীরে জঙ্গলের দিকে এগোতে লাগলাম। খানিক দূরে গিয়ে হাতের একটা জোরালো ঝাঁকুনি দিতেই মাজল পড়ল খসে। প্যান্থারও ওমনি পেছন ফিরে না চেয়েই এক দৌড়ে সটান জঙ্গলের ভেতর। প্রায় মিটার পঞ্চাশেক ছুটে গিয়ে একটা গাছ পেয়ে সে তার ওপরে চড়ে বসল।

বনের সন্তানকে এইভাবে আবার বনের কোলে ফিরিয়ে দিয়ে আমরা গ্রামে ফিরে এলাম ।

সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে অনুলেখন--দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

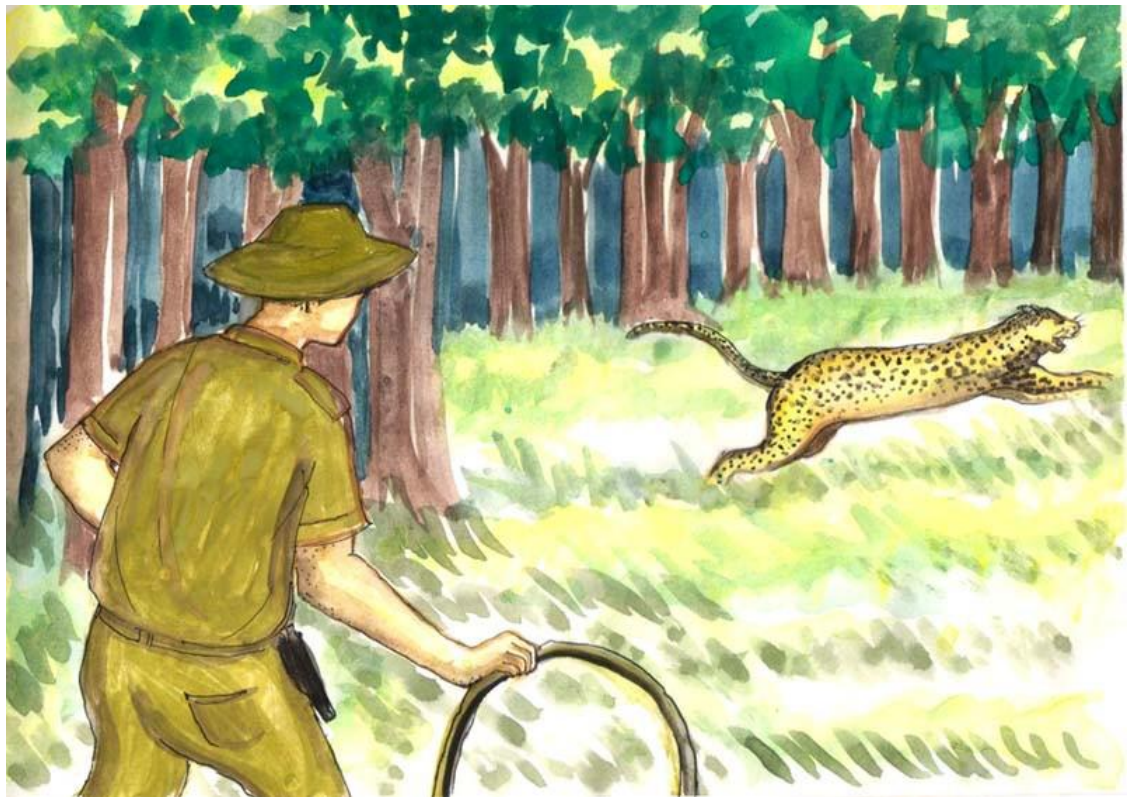

তোত্তো চান

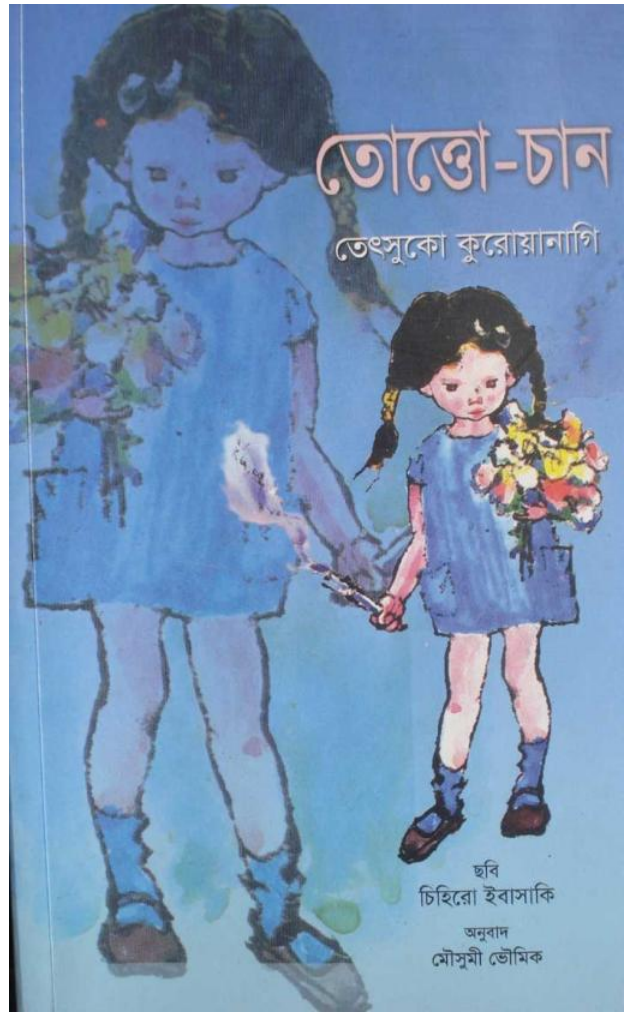

ছোট্ট মেয়ে তোত্তো চান। তার বন্ধু হল পাড়ার যত পাখ-পাখালি আর জন্তু-জানোয়ার। কখনো সে হতে চায় গুপ্তচর, কখনো বা ট্রেনের চেকার। স্কুলে গিয়ে হয় সে দাঁড়িয়ে থাকবে জানালার ধারে নয়তো খুব জোরে জোরে ডেস্কের ডালা খুলবে আর বন্ধ করবে। শেষমেষ স্কুল থেকে তাড়িয়েই দিল তোত্তো চানকে। তখন ম ায়ের হাত ধরে ট্রেনে চেপে তোত্তো চান গেল এক নতুন ধরণের স্কুলে ভরতি হতে। স্কুলের নাম 'তোমোই গাকুয়েন'। প্রথম দেখেই স্কুলটাকে ভীষণ ভালো লাগল তোত্তো চানের। ভালো লাগবে না? ক্লাস যে হয় রেলগাড়ির পুরোনো কামরাতে। দিদিমনিরা কেউ আগের স্কুলের মতন বকাঝকা করে না। তোমোই-তে যার যা ইচ্ছা সে তাই করতে পারে। অতএব থেকে গেল তোত্তো চান। নতুন স্কুলে হরেক রকম মজার ব্যাপার। যেমন, ক্লাসের শেষে সদলবলে ঘুরতে যাওয়া, গরম পড়লে সুইমিং পুলে চান করা, কখনো কখনো হলঘরে তাঁবু খাটিয়ে ক্যামপিং করা, স্কুল থেকে সবাই মিলে খুব দূরের কোন গ্রামে বেড়াতে যাওয়া - আরো কতকি। তোমোইয়ে হাসি-মজার ভেতর দিয়ে জীবনের দরকারি সব শিক্ষা দেওয়া হত যাতে বাচ্চারা কখনো সেসব না ভোলে। তারপর অনেক বন্ধুও হল তোত্তো চানের। তারপর? উঁহু আর বললে যে হবে না। জানতে হলে পড়ে নিও 'তোত্তো চান'। দুষ্টু মিষ্টি মেয়ে তোত্তো চানের মজার দুনিয়ার এক অসাধারণ গল্প, পোড়ো কিন্তু!

--**মহাশ্বেতা**

বই : তোত্তো চান
লেখক: তেৎ সুকো কুরোয়োনাগি (অনুবাদ: মৌসুমী ভৌমিক)
প্রকাশনী :ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট
দাম : ৫৫ টাকা

সেবারে আমাদের দার্জিলিং যাবার কথা হল। মা ছোটমামা, শিবু আর আমি। তাই শুনে আমাদের এত আনন্দ হল যে বলার নয়। সেই রাতে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম যে—

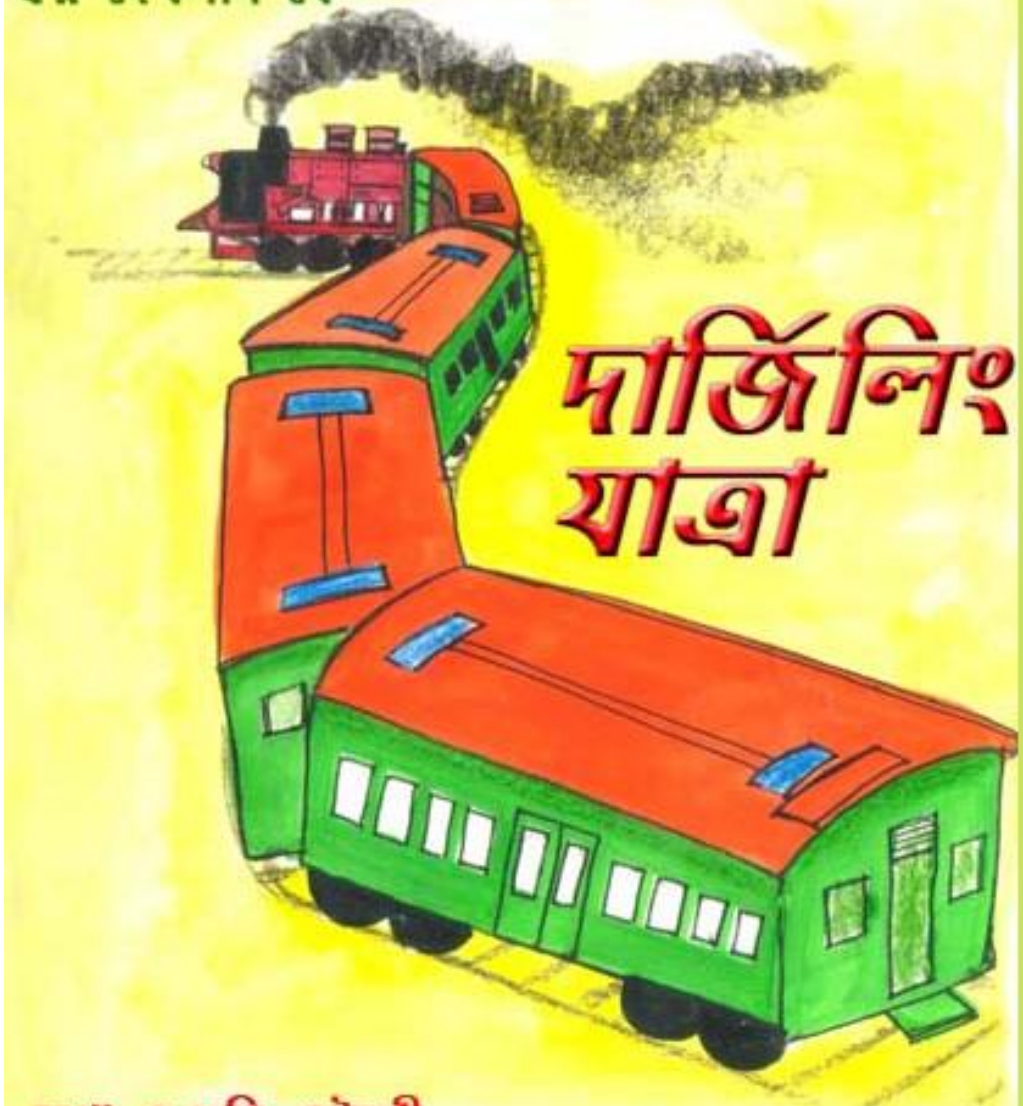

দার্জিলিং যাত্রা

কথা ও ছবি: মৌসুমী

দেখি, আকাশের গায়ে উলটে আছে পাহাড়, কোণাকুণি পাইনগাছ
আর লালছাদ বাড়ি। দেখতে দেখতে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

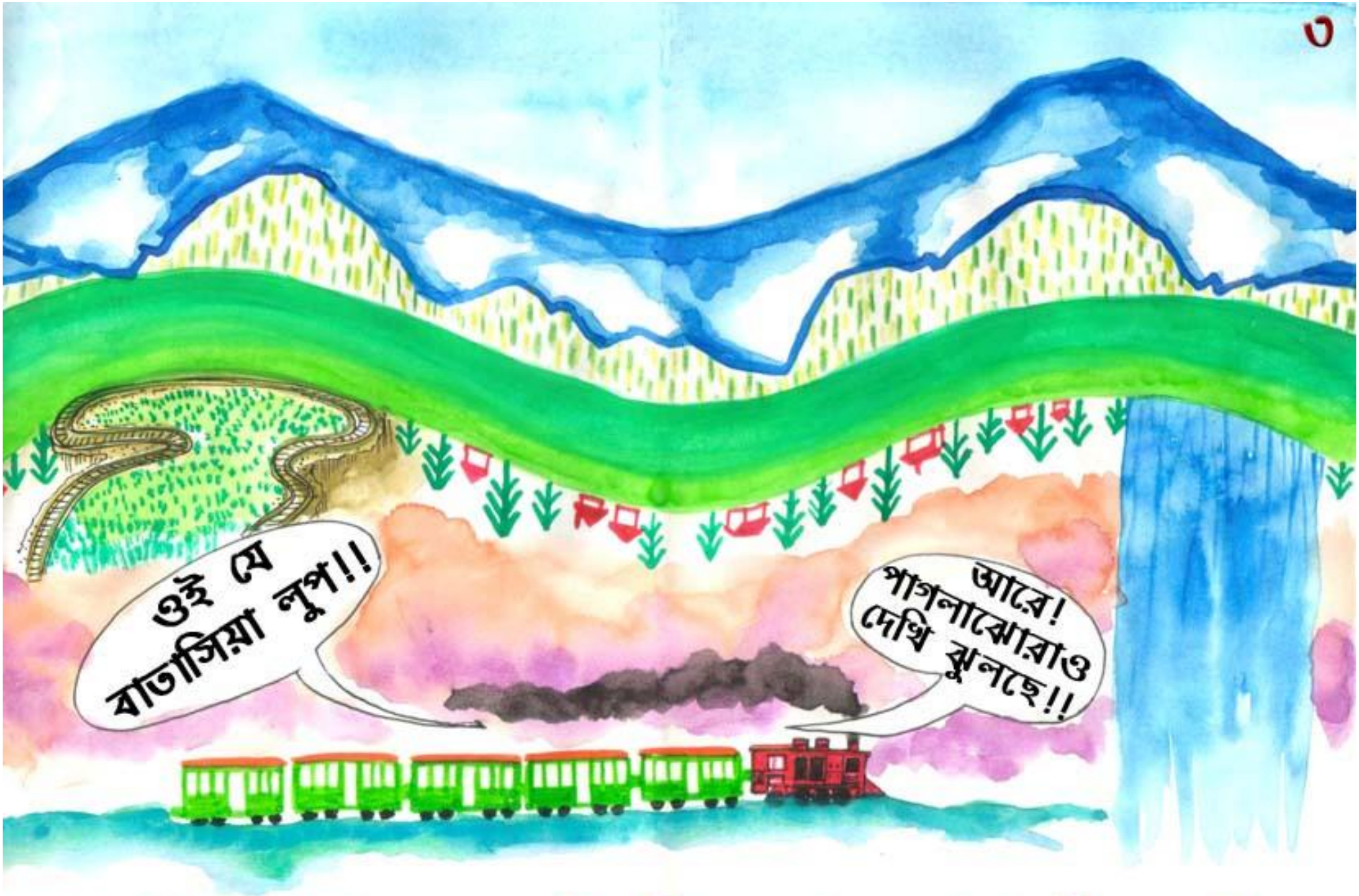

পাগলাঝোরার জলে ট্রেন ভিজে গেলে যাবো কী করে?

এমন সময় দার্জিলিং থেকে ঝুরঝুরে বরফ
ঝরতে লাগল ফুলের পাপড়ির মতন।
তার সাথে মেঘ এল ভেসে ভেসে।

ট্রেনের ভেতরটা মেঘে ভরে গেল।
আমরা মাকে জড়িয়ে ধরলাম।
মামা বলল, 'ঘুম এসে গেছে।'

উল্টো ঘড়ি

(২০০৮ সাল থেকে মধ্যভারতের নানা উপজতি এলাকায় বিক্রি হয়ে চলেছে এক বিচিত্র দেয়াল ঘড়ি। এই ঘড়ির কাঁটা ঘোরে উল্টো দিকে। সারা দুনিয়ায় সময় যখন অতীত থেকে চলেছে ভবিষ্যতের দিকে, তখন এই ঘড়ি বলছে চলো ফিরে যাই পুরোন দিনে, বর্তমান থেকে অতীতের দিকে। কেন এমন ঘড়ি তৈরি হল?)

বাংলা ভাষায় একটা কবিতা আছে--দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর। সোজা কথায় গাছপালা কেটে কংক্রিটের জঙ্গল বানানোর প্রতিবাদ করা হয়েছে সে কবিতায়। মানুষের 'সভ্যতা' যত এগিয়েছে ততই গড়ে উঠেছে বড় বড় শহর আর কারখানা, আরো উঁচু বাড়ি, ততই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে প্রকৃতির নিজস্বতাকে।

'সভ্যতা'র এই যে 'এগিয়ে চলা' এতে সবচেয়ে বেশি মার খেয়েছে দেশের অরণ্যবাসী আদিবাসী মানুষেরা। অন্য জায়গা থেকে আসা 'উন্নত' মানুষেরা এসে তাদের ঘরে ঢুকে পড়ে সে ঘর ভেঙে নিজের ঘর গড়েছে। বেচারা আদিবাসী নি:শব্দে মার খেয়ে হয় হারিয়ে গেছে, নয় ভিখিরি হয়ে গেছে। এই ট্র্যাজেডি আজও চলেছে একইভাবে। এমনি করেই কত যে আদিম জনজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে আমাদের ভারতের বুক থেকে কে জানে। যেমন ধরো আন্দামানের 'জঙ্গিল'। 'সভ্য মানুষের সংস্পর্শে আসবার ঠিক এক শো বছরের মধ্যে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা বলেন, সভ্য সমাজের যে'সব অসুখবিসুখ তার জীবাণুদের আক্রমণই শেষ করে দিয়েছে জঙ্গিলদের।

অথবা ধরো গ্রেটার আন্দামানীদের কথা। আজ থেকে ঠিক দেড়শো বছর আগে সাহেবরা যখন ভারতীয় বিপ্লবীদের বন্দি করে রাখবার জন্য আন্দামানে জেলখানা খুলল, তখন সেখানে গ্রেটার আন্দামানীদের দশটা আঞ্চলিক দলে পাঁচ হাজার মানুষ ছিল। বলতে পার তারাই ছিল আন্দমান দ্বীপপুঞ্জের প্রধান বাসিন্দা। তারপর তো সভ্যতার জয়রথ আন্দামানের বুক দিয়ে গড়গড়িয়ে ছুটল। ঠিক চল্লিশ বছর পর, ১৯০১ সালে দেখা গেল, তাদের সংখ্যা এসে ছ শোয় ঠেকেছে। ১৯২৭-এ সংখ্যাটা নেমে হল এক শো। আজ, স্ট্রেইট আইল্যাণ্ডে , প্রায় চিড়িয়াখানার জীবের মত করে পুষে রাখা আছে গোটা পঞ্চাশেক গ্রেটার আন্দামানীকে। জারোয়াদেরও একই দশা। তাদের বসতি এলাকার মধ্যে দিয়ে সভ্যতার জয়রথ ছুটেছে সরকারী হাইওয়ে দিয়ে। যে ক'জন জারোয়া এখনো টিঁকে আছে, তারা এখন মাঝে মাঝে হাইওয়ের ওপরে চলে আসে ভিক্ষে

করতে। আর চিড়িয়াখানায় গিয়ে জন্তুদের যেমন ছবি তোলা হয়, সভ্য টুরিস্টরা তখন তাদের তেমনি ছবি তুলে নিয়ে যায়। তোমাদের কারো কারো বাড়িতেও হয়ত সে ছবি আছে।

শুধু মরে শেষ হয়ে যাওয়াই নয়। অনেক জায়গায় আবার 'সভ্যতা'র আক্রমণে আর এক ভাবেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে আদিবাসী মানুষেরা। সভ্য মানুষেরা এসে তাদের পূর্বপুরুষের জমি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের কারখানার শ্রমিক, চোর-ডাকাত বা ভিখিরি বনিয়ে দিচ্ছে, তাদের মুখের ভাষা বদলে দিয়ে , তাদের সংস্কৃতিকে ভুলিয়ে দিয়ে তাদের আত্মাটাকেই মেরে ফেলে মিশিয়ে নিচ্ছে মূলস্রোতের সঙ্গে। বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে গিলে নেয় ঠিক সেই ভাবে।

সারা পৃথিবী জুড়েই নানাভাবে প্রতিবাদও চলেছে এই ব্যাপারটার বিরুদ্ধে। মধ্যভারতের গোন্দরা প্রতিবাদটা করছে একটা একেবারেই নতুন কায়দায়। তাদের প্রার্থনা, দাও ফিরে সে অরণ্য। চাইনা তোমাদের এই শহর। চাইনা একুশ শতকের সভ্যতাকে। নিজেদের সেই ইচ্ছেকে প্রতীকি রূপ দিয়েছে তারা, এক বিচিত্র ঘড়ি বানিয়ে।

গোন্দরা বিশ্বাস করে বাঁ থেকে ডাইনে চলা অশুভ। ঘড়ির কাঁটার ক্রমাগত ডানদিকে ঘুরে যাওয়া সময়ের এগিয়ে চলার প্রতীক। আর সেই এগিয়ে চলার ফলেই তো আদিবাসীরা তাদের ঘর, জমি, সংস্কৃতি সব হারাচ্ছে।তাই তারা চাইল, সময় এগোবার বদলে পিছিয়ে যাক। উল্টোদিকে ঘুরুক ঘড়ির কাঁটা। ২০০৮ সাল নাগাদ ছত্তিশগড়ের কোরিয়া জেলার 'গোন্দোয়ানা সমাজ' সিদ্ধান্ত নেয়, তারা ডাইনে থেকে বাঁয়ে ঘোরা ঘড়ির ব্যবহার শুরু করবে। সেই শুরু। তারপর ধীরে ধীরে এর ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ছে গোটা মহাকোশল এলাকার উপজাতীয় এলাকায়। তারপর থেকে ধীরে ধীরে এই উল্টো দিকে চলা ঘড়ি হয়ে উঠছে, এগিয়ে চলা সভ্যতার আক্রমনের বিরুদ্ধে আদিবসীদের প্রতিবাদের এক নীরব পদ্ধতি। নিজেদের শেকড়ের দিকে ফিরে যাবার এ এক প্রতিকি চেষ্টা আমাদের, বলছেন গোন্দোয়ানা মহাসমাজ-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আমন সিং পোর্তে।

মহাকোশল অঞ্চলের দিন্দোরি এলাকায় গত দু দশক ধরে আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছেন একজন বাঙালি মানুষ। তাঁর নাম রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্টো ঘড়ির ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠাকে বিশ্লেষণ করেছেন তিনি এই বলে, 'ঘড়িকে উল্টোদিকে চালিয়ে এঁরা আধুনিকতার উত্থান ও সময়ের দাসত্বকে অস্বীকার করতে চাইছেন।'

ভাবো কাণ্ড! সময়কে উল্টো দিকে চালাবার দাবি। বিচিত্র এই দেশের বিচিত্রতর মানুষের এ এক নতুন খেয়ালখুশি, নাকি, অসহায় একদল মানুষের নি:শব্দ প্রতীকি প্রতিবাদই বলব একে? তোমরা কোনটা বলবে?

ইন্দ্রশেখর

ধাঁধা

ধাঁধা আনতে গিয়ে এবারে ভারি মুশকিলে পড়তে হলো। মামামণি তার ভয়ানক শয়তান ছেলে বুবলুকে অংক করাচ্ছিল, আমায় দেখেই বলে, ওই নে বুবলু, তোর উপযুক্ত মাস্টার এসে গেছে। হুঁ হুঁ বাবা, এরা হল গিয়ে জয়ঢাকি দাদা। দেখ কেমন চুটকি মেরে সময় কার্যের অংক বুঝিয়ে দেয়। বলতে বলতে এক লাফে মামামণি হাওয়া।

তারপর ঘন্টাখানেক দস্যি ছেলেটার সঙ্গে গলদঘর্ম হয়ে তাকে সময় কার্যের অর্ধেকটা প্রশ্নমালা করিয়ে ফেলে যখন বেশ গর্ব অনুভব করছি এমন সময় দাঁত খুঁটতে খুঁটতে মামামণির পুণ:প্রবেশ। বোঝাই যাচ্ছিল শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ের কোন দোকান থেকে ভালো কিছু সেঁটে এসেছে। রাগে জ্বলতে জ্বলতে বললাম, 'নিজে দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে খেয়ে দেয়ে ঘুরে বেড়ান আর কঠিন অংক করাবার সময় ইন্দ্র।'

মামামণি চোখ গোলগোল করে আমার দিকে খানিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলল, ''হুম্‌। তোর অহংকার হয়েছে রে ইন্দ্র! ভেবেছিস সময় কার্যের কুড়িটা অংক করিয়ে খুব হনু হয়েছিস না? আচ্ছা এই অংকটার জবাব দে দেখি! অনেকটা তোদের চৌবাচ্চার অংকের মতন--

একটা জাহাজের গায়ে একটা লোহার মই উল্লম্ব ভাবে লাগানো আছে জলতল থেকে একেবারে ডেক অবধি। মইটার গায়ে এক ফুট দূরে দূরে কুড়িটা ধাপ। সমুদ্রের জল যদি এবারে প্রতি আধ ঘন্টায় পৌনে এক ফুট করে উঁচু হয় তবে জাহাজের ডেকে জল পৌঁছুতে কত সময় লাগবে?''

''দাঁড়াও, এক্ষুণি কষে দিচ্ছি'' এই বলে কলমটা হাতে নিতে যেতেই হ্যা হ্যা করে হেসে ম ামামণি বলে, ''তার মানে পারলি না।''

''মানে?''

''মানে হল, যে মুহূর্তে তুই হাতে কলম নিলি সে মুহূর্তে প্রমান হল তুই এটা পারবি না। কারণ কলম দিয়ে এর উত্তর বেরোবে না। এটাই এবারের **প্রথম ধাঁধা।**

দ্বিতীয় ধাঁধাঃ

তোমার কাছে একটা খেলনা আছে যেটা দম দিলে ঠিক পাঁচ মিনিট চলে। আরেকটা খেলনা আছে যেটা দম দিলে ঠিক দু মিনিট চলে। তোমার কাছে কোন ঘড়ি নেই। তোমায় একটা ডিম ঠিক তিন মিনিট সেদ্ধ করতে হবে। এই দুটো চাবি দেয়া খেলনা দিয়ে ডিম সেদ্ধর সময়টা কীভাবে হিসেব করবে?

তৃতীয় ধাঁধা:

বিভিন্ন চিহ্ন দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো--

১--২--৩--৪--৫--৬--৭--৮--৯-- উ ১০০

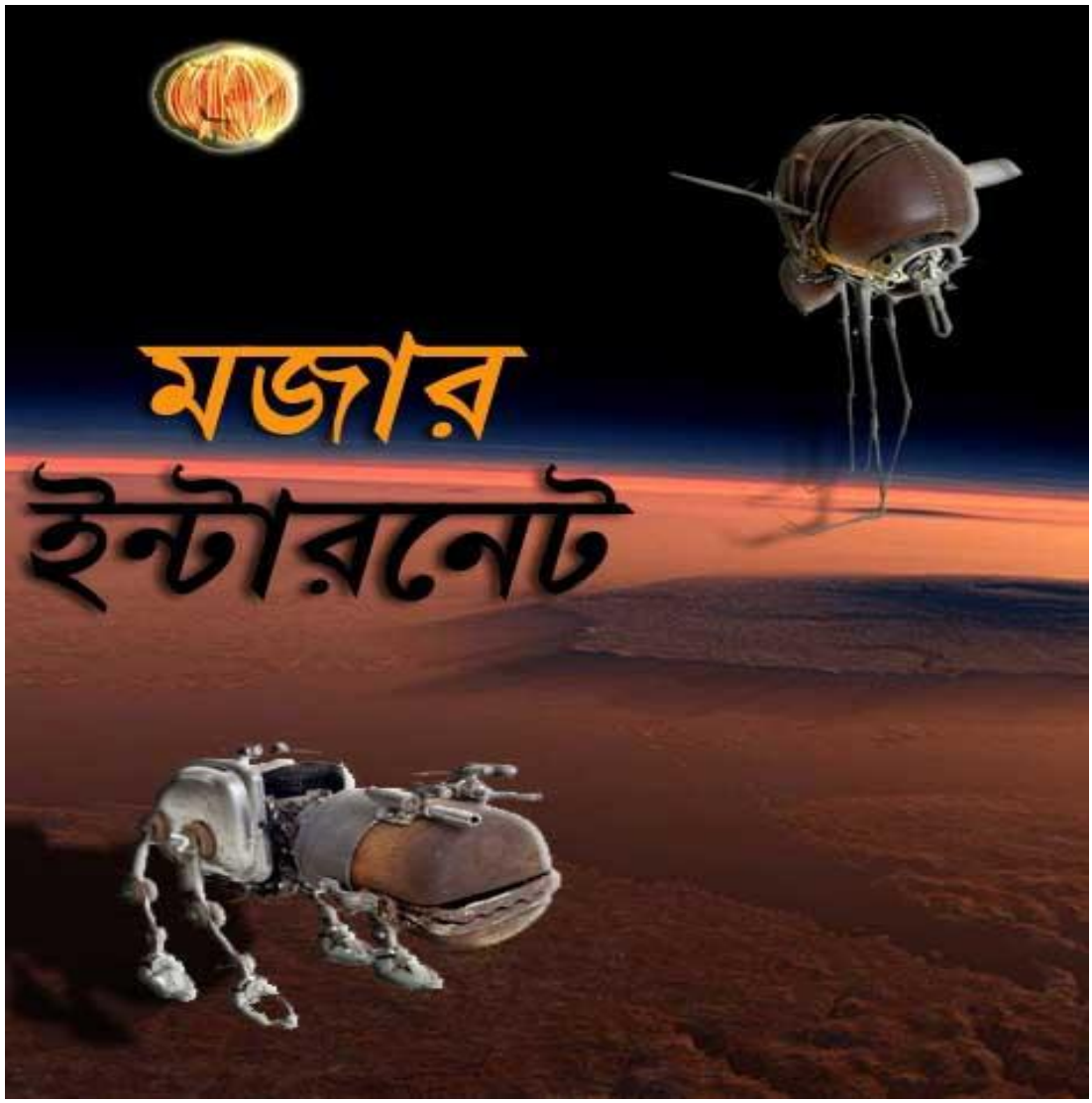

১। মঙ্গল গ্রহের অবিশ্বাস্য সব ছবি দেখতে হলে এই সাইটটা দেখো: http://www.presidiacreative.com/21-unbelievable-photographs-of-mars/

২। স্টিমপাংক ভাস্কর্য কাকে বলে? উঁহু, বলবো না। জানতে হলে এইখানটায় দেখো। বেজায় মজা পাবে। গ্যারান্টি।

http://www.beautifullife.info/art-works/remarkable-collection-of-steampunk-sculptures/

৩।আগুন দিয়ে ছবি আঁকবে? কেমন করে আঁকবে আর কেমন করেই বা তাকে ধরবে ক্যামেরায় তা জানতে হলে এই সাইটে যাও। উপরি পাওনা , আগুন দিয়ে আঁকা দুর্ধর্ষ সব ছবি।

http://www.diyphotography.net/create-great-light-painting-imagery-using-fireworks

এই প্রসঙ্গে বলি, সঙ্গের ছবিটা কিন্তু কোন কাল্পনিক ছবি নয়, এই তিনটে সইটের তিনটে ফটোগ্রাফ (মঙ্গলের পিঠ, স্টিমপাংক ভাস্কর্য ও আগুন দিয়ে আঁকা ছবির তিনটে উদাহরণ জুড়ে বানানো হয়েছে এই অলৌকিক দুনিয়ার ছবি। সাইটগুলোতে অমন আরও অনেক দেখতে পাবে।

জানো কি?

১। জিরাফের হৃৎপিণ্ড দু ফুট লম্বা হয়।

২। আকাশে যে বিদ্যুত চমকায় তার পরিমাণ দশ কোটি ভোল্ট।

৩। মানুষের কোষে থাকে তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম। সে তুলনায় ক্রে ফিশ জাতের প্রাণীদের কোষে থাকে দুশো জোড়া ক্রোমোজোম।

৪। একদা আইসল্যান্ডে কুকুর পোষা আইনত দন্ডনীয় ছিল।

৫। ভেড়া ছাগলের মিশ্র জীবকে বলে গিপ।

৬। অটল বিহারি বাজপেয়ীকে মনে আছে? সেই যে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন? তা তিনি ভারতের চারটে বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিভিন্নবার নির্বাচনে জিতে রেকর্ড করেছিলেন। রাজ্যগুলো হল, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, দিল্লী ও গুজরাট।

৭। 'ইউ ক্যানট বিট দ্য বাজাজ'-- বাজাজ কোমপানির এই বিখ্যাত স্লোগানটার জন্ম হয়েছিল ইশকুলের ক্লাসরুমে। রাহুল বাজাজ তখন ছোট। একদিন বদমায়েশি করায় মাস্টারমশায় যখন তাকে মারতে এলেন তখন সে তেজি গলায় জানায় 'ইউ ক্যানট বিট দ্য বাজাজ'। তারপর তার কী যে হাল হয়েছিল সে তো আন্দাজ করতেই পারছো! কথাটা অবশ্য সে ভোলেনি। পরবর্তী যুগে এ লাইনটা বাজাজ কোমপানির সুবিখ্যাত স্লোগান হয়ে ওঠে। ভারতের শহরের পথে সাধারণ মানুষের দুই সেরা বাহন অটোরিকশা আর স্কুটার এই বাজাজ কোমপানির অবদান।

৮। গাভাসকার , বেঙ্গসরকার ও আজহারুদ্দিনকে ভারতীয় ক্রিকেট ছাড়া আর কোথায় একত্রে পাওয়া যাবে বলো দেখি? পারলে না তো? পাওয়া যাবে সলমন রাশদির 'মুরস্ লাস্ট সাই' নামের উপন্যাসের। সেখানে এ নাম্গুলো পুষ্যিদের।

৯। প্রাচীন মিশরে ডাক্তাররা শল্যচিকিৎসা করতে ভয় পেতেন কারণ অপারেশন চলাকালীন রোগি মারা গেলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের হাতদুটো কাটা যেত।

১০। প্রাচ্যের ইটালিয়ান বলা হয় তেলুগু ভাষাকে।

কুইজ।

১। মহম্মদ কুলি কুতুব শা ভারতের কোন স্থাপত্যটির জনক?

২। সুরকার দিলীপ কুমারের প্রচলিত নামটি কী?

৩। ভানু আথাইয়া 'গান্ধী' ছবিতে অস্কার জিতেছিলেন কোন শ্রেণীতে?

৪। বর্ণান্ধ কারা বেশি হয়? মহিলা না পুরুষ?

৫। কোন দেশে দীপাবলিকে তিহার বলে ডাকে?

৬। দশেরায় রাবণের সঙ্গে আর কার কার মূর্তি পোড়ানো হয়?

৭। গুজরাতি নাচ 'গরবা'-র আক্ষরিক অর্থ কী?

৮। থাইল্যান্ডের দীপাবলীর নাম কী?

৯। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে সাহেবরা সেপাই বিদ্রোহ নাম দিয়েছিল। কে একে প্রথম 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ' আখ্যা দেন?

১০। ভারত যখন স্বাধীন হল তখন ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী কে?

ডুডলঃ

এটা কীসের ছবি

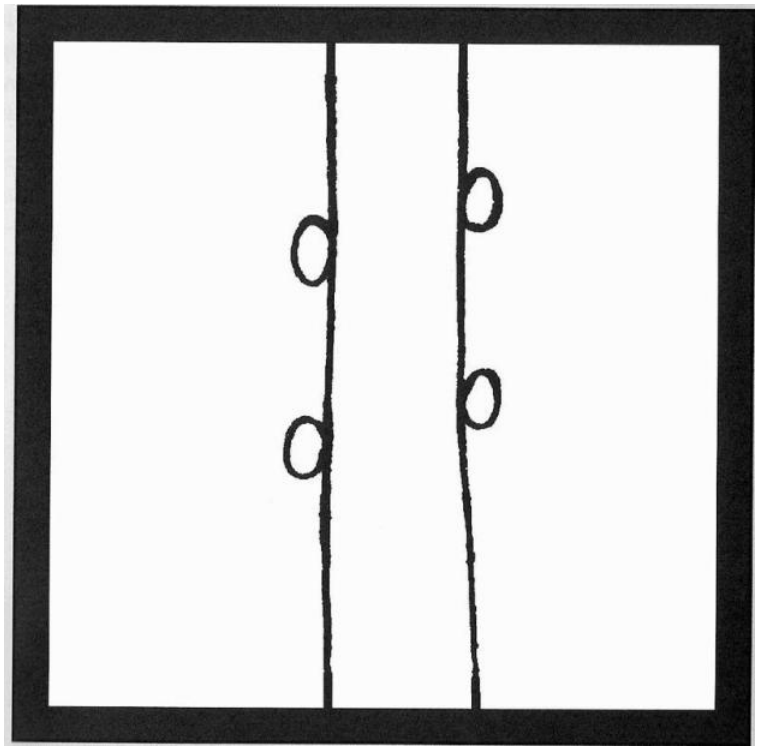

সব মদ্রমুশি

ঝোলা পা গড়া সফল

শ্রী গমপটি যোকেউ

ফনারা গাল সয়

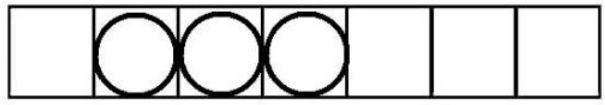

এইবারে গোল দেয়া ঘরের অক্ষরগুলো নিয়ে এই ধাঁধাটার উত্তর বানাও–

"নীলকন্ঠ সুর করে গায় এক নম্বর অংক"

অবিশ্বাস্য

স্বচ্ছ ডানার প্রজাপতি-প্রকৃতির এক বিচিত্র খেয়াল।

শব্দচৌখশ

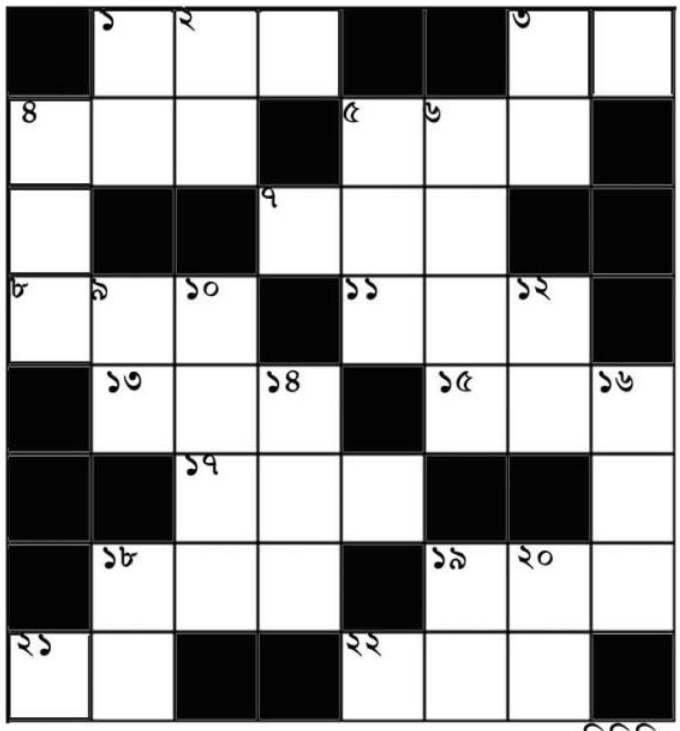

বিবিজি

পাশাপাশিঃ

১)দঃ ভারতের নদী,গেছে পুবে। ৩)প্রবলশক্তি,গরমকালে টেরটি পাবে।৪)গাছ এই পোশাক জড়ায় গায়ে। ৫)বইলে লোকে আরাম পায়। ৭)সোঁদরবনে এ গাছ আছে। ৮)সরোদ এলো এরই পাছে। ১১)শরৎ বাবুর গল্পে খোঁজো ১৩)ভৈরবরাগের সময় বোঝো। ১৫)খেওনা, ঝালে মরে যাবে। ১৭)এমন স্বরে মজে সবে। ১৮)গড়িয়ে দিলাম, বয়ে যা রে। ১৯)যন্ত্র সরল মাটি খোঁড়ে। ২১)দুধটি এর খেতে বেশ। ২২)আর কিছু নয়, মাছের আঁশ।

উপর-নীচঃ

১)কাজল কালো , এ-ও কালো। ২)সাদা ফুলটি, গন্ধ ভালো। ৩)খেয়াল গানের সঙ্গে গাও। ৪)হেথায় যাবে থলে নাও। ৫)ফুলের রেণু কয়রে এরে। ৬)লেখক ইনি, ফুল নয় রে। ৯)ছয়টি চাকায় ছুটে চলি। ১০)অসুর এ যে, ভীমের বলি। ১২)এসব মেখে ভূত হলে? ১৪)হার্ডির জুড়ি,কমিক রোলে। ১৬)চোখে লাগাও, আহা মরি। ১৮)এর ছায়াতে আরাম করি। ১৯)এর সঙ্গে কাসুন্দি দাও। ২০)ক্রিকেট মাঠে সঙ্গে নাও।

মজার খেলা

সাতটা সমকোণী ত্রিভূজ দিয়ে

এই বুড়োমানুষটাকে ধরতে হবে।

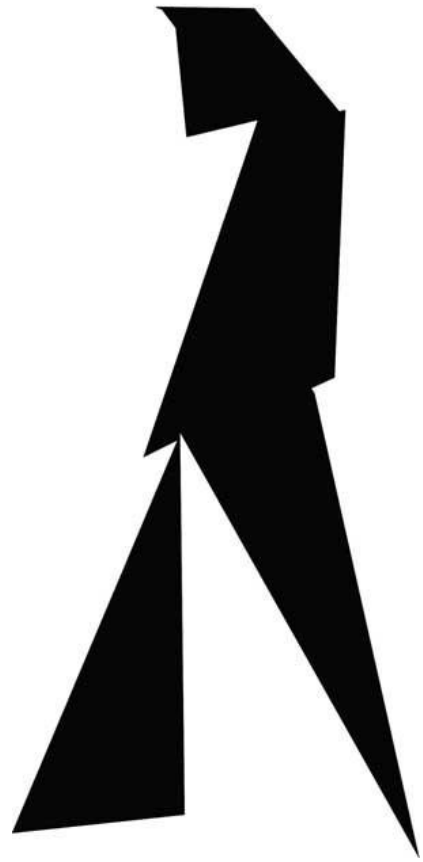

গত সংখ্যার উত্তরঃ

ধাঁধার উত্তর

প্রথম ধাঁধা:

প্যানে দুটো পাটিসাপটা নিয়ে প্রথম মিনিটে তাদের একপিঠ সেঁকো। দ্বিতীয় মিনিটে একটা পাটিসাপটাকে উল্টে দাও ও অন্য পাটিসাপটাকে একপিঠ সেঁকা অবস্থায় নামিয়ে রেখে তৃতীয় পাটিসাপটা প্যানে দাও। তৃতীয় মিনিটে দুপাশ সেঁকা পাটিসাপটাকে নামিয়ে দিয়ে তার জায়গায় প্রথমবারের আধাসেঁকা পাটিসাপটার ও দ্বিতীয়বারের অন্য আদাসেঁকা পাটিসাপটার কাঁচা পিঠদুটো একসাথে সেঁকে নাও। তারপরে পাটিসাপটা তিনটেকে খেয়ে ফেলো। কেমন খেতে? ভালো না?

দ্বিতীয় ধাঁধা:

ঝাঁটা

তৃতীয় ধাঁধা: নোঙর

চতুর্থ ধাঁধা: জাল।

পঞ্চম ধাঁধা: ছিপ

কুইজঃ

১। সিঙ্গাপুর ২। নোজ প্রিন্ট ৩। প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ ৪। তাঁরা দুজন কানে শুনতে পেতেন না। ৫। ভেকটনরসিংহরাজুভারিয়াপেটা ৬। চিন ৭।তাউমাটঅহাকাতাংগিহাংগাওআউ আউওতামেতেয়াতুরিপুকাকপিকিমাউংগাহোরোনুকুপোকাইঅহেনুয়াকিতানাতাহু (Taumatawhakatangihangaoauauotameteaturipukakpikimaungahoronu kupokaiwhenuakitanatahu) ৮। স্প্যানিশ রিবড্ নিউট। ৯।১২৩৪৫৬৭৮৯৮৭৬৫৪৩২১ ১০। রেড ইন্ডিয়ান ভাষা। অর্থ হল বড় গ্রাম।

হযবরল-র উত্তরঃ

মহাবিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন, স্বর্গমর্তপাতাল, বেগুনপোড়া খাবো, দই ইলিশ

প্রশ্নের উত্তর:

বিশাল ইলিশ খাবে

ড্রুডল-এর উত্তরঃ

একদল শ্বেতকণিকা একটা জীবাণুকে তাড়া করে স্লাইডের বাইরে বের করে দিচ্ছে (মাইক্রোস্কোপে দেখা)

শব্দচৌখশঃ

পাশাপাশি:

১। খেয়াল গায়ক ৭। পদবি বল হে ৮। লামে ৯। তব ১০। লাকু ১২। ভূধর ১৪। তব দাসানুদাস এই বেচারা ১৫।কেশিনী ২০। তলতলে ২১।নবনী ২২। রবীশ ২৫।কাক ২৬। বয়। ২৭। নক ২৮। হাল জাল হাল ২৯।প্রভু বেশ মজা

ওপর-নিচ

১। খেপলা ২। য়াদমে ৩। হোটেলে গেলে দেখতে পাবে, ফেরার সময় উল্টে পাবে ৪। গাবতলাতে ভূত থাকে ৫। য়লবকু ৬। কহে ১১। বরদায়িনী ১৩। ধব ১৬। নুতন ১৭। দাল ১৮। সত ১৯। এলেম ২৩।বীচা ২৪। করবে কেন ২৯। প্রহা ৩০। ভুল বকা ৩১। বেজায় কর্কশ রাগিনী ৩২।শল ৩৩।মহান ৩৪। জালক

মজার খেলার উত্তর:

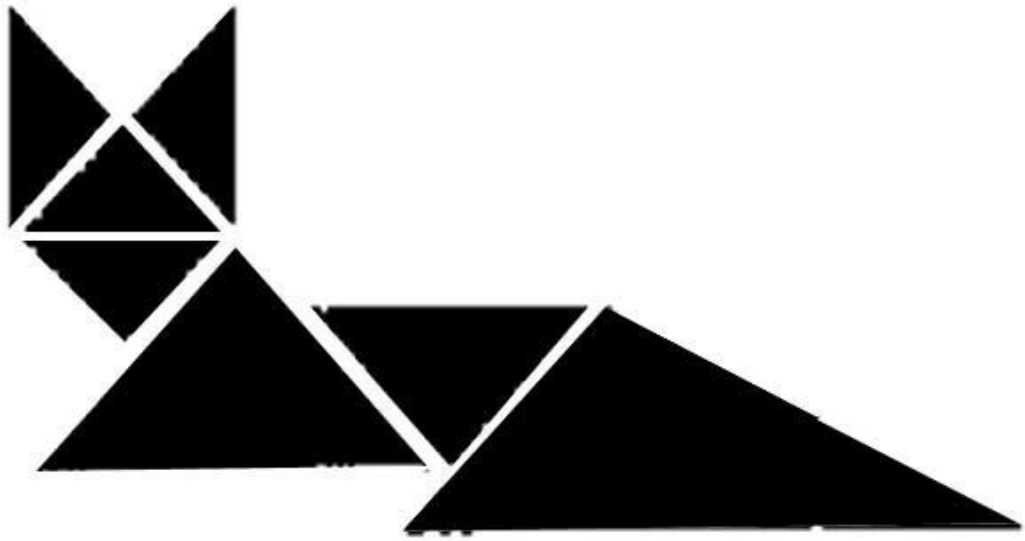

মালাবার উপকূলে ঘুরতে গিয়ে প্রফেসর সত্য সুর খবর পেলেন, ইহুদিদের একটা শাখা অনেককাল আগে বর্মা মুলুকের পাহাড়ে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। সে কথার সমর্থন মিলল মিশন অব কিউরো নামের এক প্রাচীন অভিযানের দলিল থেকেও। তাদের খোঁজে অভিযাত্রী ক্লাবের সদস্যরা অভিযানে বেরিয়ে আইজলে এসে পৌঁছোল। তারপর----

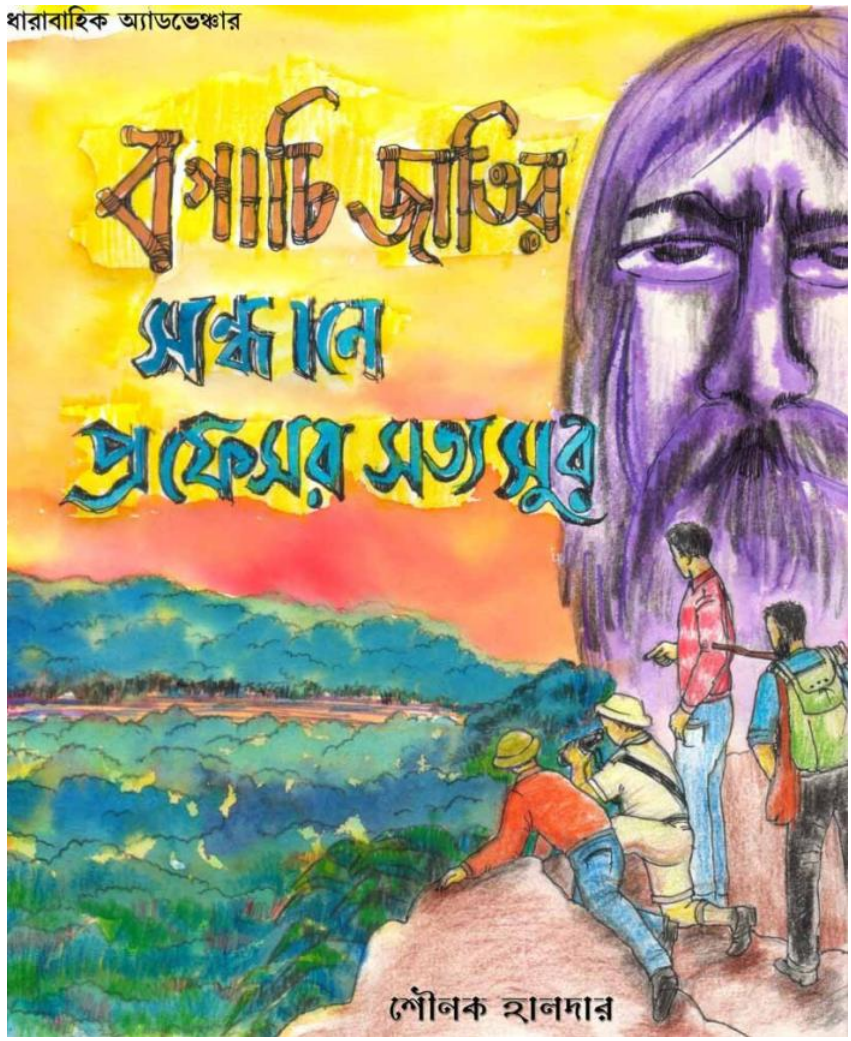

অভিযান পর্ব----১

অধিরাজের ডায়েরি থেকে

১৬ই অক্টোবর, দুপুর

লেংপুই এয়ারপোর্টে আমাদের নিতে এসেছিল জোরাম জোরামথাঙ্গা। হাসিখুশি আমুদে ছেলে। টুপি নামিয়ে বাও করে বলল,''ওয়েলকাম তু মিজোরাম, '' তারপর বাংলায় বলল, ''পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো স্যার?'' দানিকেন বাংলার বাইরে বাংলা শুনে উচ্ছসিত। বললো, ''বাংলা জানেন আপনি?''

''ইয়েস সার। কলকাতার মিজোরাম হাউসে সাত বছর কাজ করেছি। সর্ষে বাটা দিয়ে ইলিশমাছ রাঁধতে পারি।''

মানুষ আমরা পাঁচজন। মালপত্র অনেক। জোরাম দুটো জিপ এনেছিল। মালপত্র উঠল। আমরাও উঠলাম। জোরাম জানালো, ''রোজিকা সাহেব আপনাদের জন্য অপেক্ষা করে আছেন। প্রথমে আমরা সেখানেই যাবো। সেখানে হয়ে আমরা গেস্ট হাউসে যাবো।''

এয়ারপোর্টের বাইরে এসে আমাদের মন ভরে গেল। বর্ষার শেষ। যেদিকে চাই নীলচে সবুজ পাহাড়ের সারি। মধ্যে মধ্যে ঘন কুয়াশার মতন মেঘ। পাহাড়ের গায়ে ছোট-ছোট ঘর বাড়ি, গাছপালা আর ফুল।

''কি সুন্দর! চোখ জুড়িয়ে গেল যেন।''

''উত্তর-পূর্ব ভারতের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখেছো? উত্তুঙ্গ হিমালয় নেই। কিন্তু এ-ও ভারি সুন্দর। রেঞ্জের পর রেঞ্জ চলেছে, গাছের সবুজ আর মেঘ-কুয়াশায় সাদা মিলে কি অপূর্ব রঙের খেলা চলেছে----''

''কুয়াশা মানে রহস্য।'' দানিকেন গম্ভীর মুখে জানালো।

১৬ই অক্টোবর, বিকেল

রোজিকা সাহেবের বাড়ি শহর থেকে বাইরে। অনেকটা সময় নিল পৌঁছতে। লাল টিনের চাল দেওয়া কাঠের একখানি চমৎকার বাড়ি। বাগান ও গাছগাছালিতে ঘেরা। দরজা খুলে হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন সৌম্য চেহারার রোজিকা সাহেব। মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের মুখ। চোখ দুটি অবশ্য বড়-বড়।

লাল টিনের চাল দেওয়া কাঠের একখানি চমৎকার বাড়ি।

''নমস্কার, ভেতরে আসুন।''

বসবার ঘরে অনেকগুলো সুদৃশ্য বেতের চেয়ার। কাচের জানালার মধ্যে দিয়ে দূরের পাহাড় দেখা যাচ্ছে। এখন বিকেল। গিয়ে বসতে রোজিকা বললেন, ''সবে এসেছেন, বেশিক্ষণ আটকাবো না। আজকে বিশ্রাম নিন। কাল আমার বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করবেন, আমার অর্কিডের সংগ্রহ দেখবেন। কথাবার্তাও হবে। আপনাদের গাইড, ড্রাইভার এদেরও বলা হয়েছে আসতে। পরশু ভোরবেলা আপনারা রওনা হবেন।''

কথাবার্তা ইংরিজিতে হচ্ছিল। মিজোরাম শতকরা ১০০ ভাগ সাক্ষর রাজ্য, সাধারণ লোকেদের মধ্যে অনেকেই ইংরিজি বোঝে বা বলতে পারে।

বাড়ির ভেতর থেকে আনারসের রস এল। ভীষণ মিষ্টি। বাড়িতে বানানো কেক ও নোনতা খাবার এল।

দানিকেন বললো,'' রোজিকা সাহেব, একটু আইজল শহরটা ঘুরে দেখা যাবে না ?''

''নিশ্চয়ই। জোরাম আপনাদের দেখিয়ে দেবে। কাল আমার বাড়ি আসার পথেই ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে। যদিও বেশি কিছু দেখার নেই।''

'' ভারি সুন্দর শহর আপনাদের,'' আমরা একসাথে বলে উঠলাম। রোজিকাসাহেব খুব খুশি হলেন। একটু পরেই আমরা উঠে পড়লাম। ফরেস্ট গেস্ট হাউসে আমাদের থাকার ব্যবস্হা হয়েছিল। বেশি দূরে নয় এখান থেকে। মালপত্র জিপে গেল। আমরা হেঁটে হেঁটে দুপাশের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে গেলাম।

রোজিকা সাহেব কিছু বই আর কাগজপত্র দিয়েছিলেন। রাতের খাওয়াদাওয়ার পর সত্যদা আর চঞ্চলদা তাই নিয়ে বসল। বাইরে একটা ভিজে ঠান্ডা পড়েছিল। বারান্দায় চাদর মুড়ি দিয়ে মৌজ করে বসা হল। অতনু বলল,'' পাহাড়গুলো চড়তে মনে হয় অত কষ্ট হবে না।''

''আর জঙ্গল? এদিককার জঙ্গলে জানোয়ার গিজগিজ করছে না?'' দানিকেনের বক্তব্য।

''জানোয়ার বেশি নেই রে। উগ্রপন্থী আর চোরাশিকারীরা মিলে সব শেষ করে ফেলেছে--- তবে পোকামাকড় থাকতে পারে।''

''কে জানে কেমন হবে এবারের অভিযান----'' দানিকেন একটা ফোঁস করে নি:শ্বাস ফেলল। পাহাড়ের দিক থেকে ভিজে শিরশিরে বাতাস আসছিল। শীতটা বাড়তে লাগল। পাহাড়ি ঝিঁঝিঁ ডাকছে। ভেতর থেকে সত্যদা ডাকলো, ''আয় তোরা ভেতরে আয়। কাল সকাল থেকে অনেক কাজ।''

১৭ই অক্টোবর, সকাল

সকালে জলখাবার খেয়ে আমরা বেরোলাম। আইজল শহরটা ছিমছাম। পাহাড়ের গায়ে এঁকেবেঁকে রাস্তা, সারি-সারি বাড়ি। গাছপালাও আছে। তবে আধুনিক সভ্যতার বিষাক্ত ছোঁয়া তো আছেই। ঘেঁষাঘেষি পরিকল্পনাহীন বাড়ি, বহুতলের বৃদ্ধি আর গাছকাটার হাত থেকে এই শহরও রেহাই পায়নি। গর্ভনর হাউস, সেক্রেটারিয়েট, চার্চ, ওয়ার মেমোরিয়াল এসব দেখলাম। সদর বাজারেও গেলাম। কিছু কেনাকাটা ছিল। সেখানে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

জোরাম সত্যদাকে নিয়ে গেছিল আইজলের সবচেয়ে বড় মনিহারি দোকানে-সাইমনস শপ। সত্যদা আর চঞ্চল জিনিসপত্র দেখছে। দানিকেনের চোখ পড়ল একটা অদ্ভুত জিনিসে। সচরাচর ক্যাশ কাউন্টারের পিছনে দোকানদারের ছবি বা বিভিন্ন ঠাকুরদেবতার ছবি থাকে। এখানে অনেক দোকানেই যিশুখৃষ্ট বিরাজমান। এ দোকানে তার বদলে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে একখানা মস্ত সোনালি তারা।

দোকানের মালিক হাসিখুশি মঙ্গোলিয়ান চেহারার মানুষ। দানিকেন আর কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করে ফেলল,''আপনি ক্রিশ্চান নন স্যার?''

সাইমন একটু চমকে উঠল। তারপরেই হো হো করে হেসে ফেলে বলল,''আমার পদবি খেয়াল করেননি? আমরা ইহুদি স্যার। অরিজিনাল ইহুদি। কবে থেকে কত পুরুষ ধরে এখানে রয়েছি জানি না। চেহারা দেখে অবশ্য বুঝবেন না। সব মিশ্র হয়ে গেছি।''

'' আপনারা কি একটাই ফ্যামিলি এখানে?''

''অল্প কয়েক ঘর মাত্র আছি। আপার রোডে আইজাকের কাফে আছে,খেয়াল করেছেন কি? ওরা আমাদের জ্ঞাতি।''

সত্যদা অনেকক্ষণ ধরে মিটমিট করে হাসছিল, এবার বলে উঠল, ''চঞ্চল,অভিযাত্রী ক্লাবে যারা বিড়াল ডাকছিল, তাদের গিয়ে এই ঘটনাটার কথা বলিস।হুঁ হুঁ বাবা সত্য সুর গুল মারে না।---- থ্যাঙ্ক ইউ দানিকেন, মিসিং লিংকটা আবিষ্কার করার জন্য।''

দানিকেন যাকে বলে আহ্লাদে গলে গেল।

আপনি ক্রিশ্চান নন স্যার?

আইজল টপে গিয়ে পুরো শহরটা দেখা গেল। যেদিকে তাকাও নীল পাহাড়ের সারি, ম াঝেমাঝে মেঘ বা কুয়াশা। সবুজ আর নীলের মধ্যে ছবির মতন শহর। জোরাম আঙুল দিয়ে আমাদের বাসস্হান এলাকাটা দেখালো। সবুজে সবুজ, খাদ নেমে গেছে একপাশে। তলা দিয়ে মেঘ উঠছে ধোঁয়ার মতন। সত্যদা বলেই ফেলল,'' মেঘ তো জানি ওপর থেকেই নামে। এই প্রথম নীচ থেকে ওপরে উঠতে দেখলাম। নীচে মনে হচ্ছে যেন মেঘ বানানোর কল খুলেছে।'' আমি ক্যামেরাতে চোখ রেখে ছবি খুঁজছিলাম। হঠাৎ দেখি পায়ের তলায় রামধনু! কী অপূর্ব সে দৃশ্য! আমরা কলকাতাবাসী পাঁচ বঙ্গসন্তান বড় বড় চোখ করে সেই দৃশ্য দেখতে থাকলাম।

দুপুরে রোজিকা সাহেবের বাড়িতে নেমন্তন্ন।মুরগির মাংস, লাল চালের ভাত, স্কোয়াশ-এর তরকারি, বাঁশের আচার, বাঁশে স্মোকড পর্ক বেশ তরিবৎ করে খেলাম। আনারসের রস তো ছিলই। খেয়েদেয়ে রোজিকা সাহেবের অনবদ্য অকির্ড সংগ্রহ দেখে তারপর বাগানে জুত হয়ে বসলাম। রোজিকা সাহেব তাঁর পাইপটা ধরিয়ে এক টান দিয়ে বলতে শুরু করলেন, ''এই যে উত্তরপূর্বাঞ্চলের পাহাড়শ্রেণী দেখছেন, এর একদিকে আরাকান পাহাড়, উত্তর পশ্চিম থেকে নেমে এসেছে হিমালয়ের শিরা আর উত্তর পূব দিকে চীন থেকে নেমে এসেছে হেংডুয়ান পর্বতমালা। বার্মার উত্তর অংশটা পুরোটাই পাহাড় আর দুর্ভেদ্য জঙ্গল। আমাদের ছোট রাজ্যটা একদম বার্মা ঘেঁষে। আমাদের পূর্বপুরুষরাও এসেছে তিব্বত-চীন-বার্মা হয়ে। রাজনৈতিক ভাবে আমরা বিচ্ছিন্ন হলেও ওসব দেশের লোকজনেরা আসলে আমাদেরই মতন।

''জানেন তো আমাদের লোককথার অফুরন্ত ভাণ্ডার। আমরা প্রথাগতভাবে প্রকৃতির কাছে বেশি থাকতাম (এখানে রোজিকা সাহেব হেসে ফেললেন) বলে আমাদের সব গল্পগাথায় গাছ আর জন্তুজানোয়ারদের গল্প-রহস্যও কম না।

''তা আমরা বিশ্বাস করতাম বা এখনো হয়তো করি যে, মৃত্যুর পর আমরা একটা বিশেষ পথ ধরে একটা নির্দিষ্ট হ্রদে চলে যাই। তার কাছেই মৃতদের গ্রাম ও স্বর্গ। ঐ হ্রদটা এখন বার্মাতে পড়েছে। ভাবুন মৃত্যুর পর আমাদের আত্মাদের এখন বিদেশ যেতে হয়!'' বলে উনি হো হো করে হাসতে থাকলেন। আমরাও হাসলাম।

রোজিকা সাহেব চামপাই-র কমিশনারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলিয়ে দিলেন। চিঠি ও অনুমতিপত্রের ব্যবস্হা হল। একটা বড়সড় জিপ ও ওস্তাদ ড্রাইভার এল। সে ওসব অঞ্চল

সমপর্কে অভিজ্ঞ। তার নাম জিমি। চামপাই পৌঁছুলে লোকাল পথপ্রদর্শকদের দেখা মিলবে। জিপের মাথায় মালপত্র উঠল। প্লাস্টিকের ঢাকনা দিয়ে সে'সব মোড়া হল। জিপে ড্রাইভার ছাড়াও আমরা পাঁচজন বসার কোনো সমস্যা নেই। বিশেষ করে দানিকেন পিছনে একা বসার দায়িত্বটা স্বেচ্ছায় নিল। নাকি ওখানে বসলে পিছনদিকটা নজরদারি করার সুবিধা হবে।

রোজিকা সাহেবের শুভেচ্ছা নিয়ে পরদিন ভোরবেলা আমরা আইজল থেকে চামপাই-র দিকে রওনা হলাম।

১৮ই অক্টোবর

জিমি মানুষটা মোটাসোটা। জিমি লালহুমনিমা। পথের ধারে এক জায়গায় থেমে চা খাচ্ছিলাম। সত্যদা তখন ফার্ন, অর্কিড, বাঁশ আর ফুল নিয়ে তার জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে দিয়েছে। জিমি শুনছিল; হঠাৎ বলে উঠলো, '' স্যার, একধরণের ফুলের কথা বলি শুনুন। ফুলের নাম হল হাওইলোপর। লুংলো নদীর ধারে সারে সারে ফোটে। এই ফুল আর কোথাও পাওয়া যায় না। মৃত্যুর পর মানুষ যখন হ্রদ পেরিয়ে মৃতদের গ্রামের দিকে যায় সে পিছন ফিরে কাঁদে। তারপর তার রাস্তায় পড়ে লুংলো নদী। এর জল অতি স্বচ্ছ ও নির্মল। এর জল খেলে মৃত মানুষের সব সুখদু:খ আবেগ চলে যায়। তারপর সে নদীর পার থেকে হাওইলোপর ফুল তুলে চুলে বা কানের পেছনে লাগায়। আর ফুল লাগালেই পূর্বজগতের উপর তার সব টানমায়া শেষ হয়ে যায়। সব ভুলে সে এগিয়ে যায় মৃতদের গ্রামের দিকে।''

জিমিকে থামিয়ে সত্যদা বললো, '' জিমি, ঐ হ্রদটাই তো আমরা খুঁজছি ভাই। ওখানেই যেতে হবে।''

জিমি বলে চলে,'' আমাদের বিশ্বাস কবরের পরিধি ছাড়িয়ে আত্মার একটা জগত আছে। তাতে যেতে হলে ঐ হ্রদ পেরোতে হবে। তারপর মৃতদের গ্রাম ছাড়িয়ে গেলে পিয়াল নদী, আর তার ওপারে চির শান্তির দেশ পিয়াল রাল। আমাদের স্বর্গ। একমাত্র পূণ্যাত্মারাই সেখানে থাকতে পারে। বাকিরা থেকে যায় হ্রদের পারে মৃতদের গ্রামে। স্যার, তাই ঐ গোটা এলাকাটাই অলৌকিক, রহস্যে ভরা।'' জিমির গলায় কী যেন একটা ভাব এসে গেছিল যা শুনে সবাই চুপ হয়ে গেল। শুধু দানিকেন ফোঁস করে নি:শ্বাস ফেলা শুনলাম। দানিকেন বলে উঠল,'' রহস্য, মিস্ট্রি---- মি-ই-স--ট-রি-ই----!''

এরপর আগামি সংখ্যায়

ছবি : মৌসুমী

যারা শহরে থাকে না, চাকরি করেনা, ব্যবসাও করে না, টিভিও দেখে না, যাদের বাড়ি ইন্টার নেট নেই, এমনকি মোবাইল ফোনও নেই,তারা কেমন করে জীবন কাটায়? এই প্রশ্নটা করতে আমাদের মহুল এঁকেছে দুই বউয়ের ছবি–যারা পুকুরঘাটে জল আনতে গেছেন একসঙ্গে।

বউল এঁকেছে এক ফলওয়ালির ছবি।
চড়া রোদে মাথায় ফলের ঝুড়ি নিয়ে সে হাঁকে,
"ফল চাই মা—"

আর তিতিল? সে বলেছে এক সাপুড়ের গল্প।
বাঁশি বাজিয়ে সাপের নাচের খেলা দেখিয়ে তার দিন কাটে। এই তিন গল্প নিয়েই আমাদের এবারের গ্যালারি।

গল্প +ছবি =কমিকস

কথা, ছবিঃ ঋত্বিক। ছ বছর

১. একদিন একটা ক্যাঙারু ঘুরছিলো।

২। অন্য একটা ক্যাঙারু এসে তার সাথে বন্ধুত্ব করলো। তারপর একসাথে ঘুরতে লাগলো।

৩। একদিন একটা ময়ূর এসে বল্লল,

৪। প্রথম ক্যাঙারু বলল,

৫।কিছুদিন পরে ময়ূর
একটা ডিম পাড়ল।

৬।দশ দিন ধরে তা দেবার পরে
দেখা গেল———

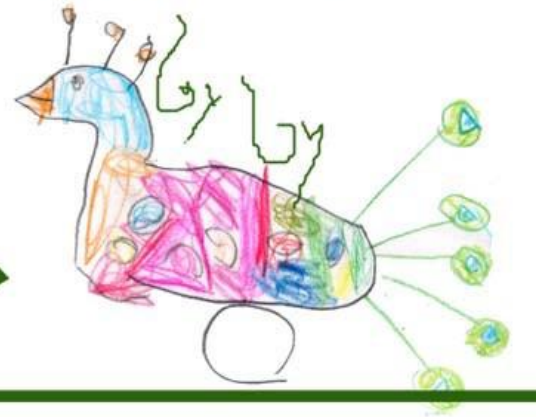

৭।একটা ছোট চমকিলা
চোখ বেরিয়ে আসছে।

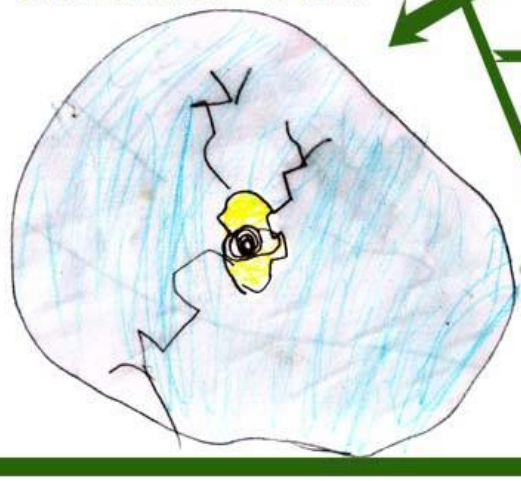

৮। ডিম ফুটে একটা ময়ূরছানা
বেরিয়ে এলো।

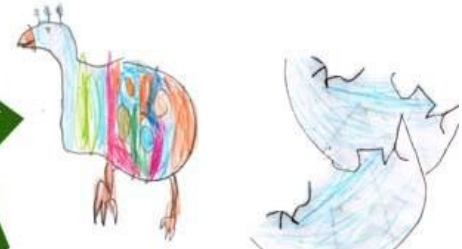

৯। ময়ূরছানা ক্যাঙারুদের পকেটে
করে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

অলি

প্রমণা চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চম শ্রেণী, শিবপুর হিন্দু গার্লস্ হাই স্কুল

ওগো, তুমি বনের অলি
তোমার মত কথা বলি।
ফুলের রেণু বয়ে নিয়ে যাও,
ফুলে বসে মধু নিয়ে খাও।
তুমি থাকো মোমের ঘরে
তোমার বাসাটা হাওয়ায় নড়ে।
তোমার দেহে কালো হলুদ দাগ,
দেখলে ভাবি তুমি বনের বাঘ।
তোমার আছে দুটি ডানা
পড়েছে তাতে কচুরি-পানা।
তোমার ছুঁচালো হুল আছে
সেটি আছে তোমার পাছে,
হুল ফুটিয়ে করেছ ক্ষতি
নামটি দিলাম হুলবতী।

ভাঙা বাড়ির আলো

ইন্দ্রদেব বসু , অষ্টম শ্রেণী নৈহাটি নরেন্দ্র বিদ্যানিকেতন

ঐ দেখো ঐ দেখা যায় ভাঙা বাড়ির আলো,
হচ্ছে কী সেখানে কোনও কাজ কালো?
হতে পারে ডাকাত বা হতে পারে চোর,
হতে পারে খুনে-- কিংবা কোনও ছ্যাঁচোর
বেকুবে ভাবে এসব ভূতের কারবার
আসলেতে এসব গুহ্য ব্যাপার,
ঐ শোনো শোনা যায় গুলির শব্দ
তবে কি হল ওরা জব্দ?
পড়েছে ধরা ওরা দারোগাবাবুর হাতে।
এবার ওদের যেতে হবে জেলখানাতে;
এই সব দেখতে গিয়ে হয়ে গেলো ভোর
পরে শুনেছি ওরা একদল চোর।।

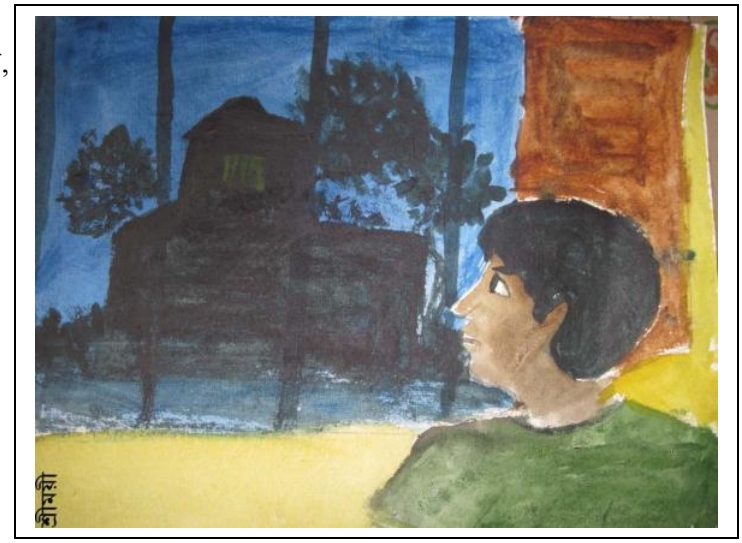

রোকেয়া

তপোজা মুখার্জি, তৃতীয় শ্রেণী। নৈহাটি পুর বিদ্যালয়

এক ছিল খানদানি মুসলিম পরিবার
পড়াশোনার সাধ ছিল রোকেয়ার
তাঁর দিদি করিমুন্নেসা
শুধু মনে রেখে আশা
পড়াতেন তাঁকে দিয়ে ভালোবাসা
বাবা আবু আলি সাবের জানলে সর্বনাশ
রোকেয়ার পড়াশোনা হবে বিনাশ
দাদা তাকে করতেন সাহায্য
যাতে কেউ জানতে না পারে রোকেয়ার কার্য
আঠারো বছর বয়সে
বিয়ে করে গেল সে
বিহারের ভাগলপুরে
সেখানে স্বামীর ঘরে
পড়াশোনা শিখে হল সে মস্ত বড়

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

অন্তরা ঘোষাল। তৃতীয় শ্রেণী। নৈহাটি পুর বিদ্যালয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন বিশ্বসেরা কবি
শান্তিনিকেতনে রাখা আছে তাঁরই অনেক ছবি
১৮৬১ সনের সাতই মে
জন্মান তিনি কলিকাতার জোড়াসাঁকোতে
পিতা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ মাতা সারদা দেবী
তাঁদেরই শিশুপুত্র হলেন একদিন বিশ্বকবি।

গীতাঞ্জলী করলেন তিনি ইংরাজিতে অনুবাদ
তারই জন্য পেলেন তিনি নোবেল পুরষ্কার
বাইশে শ্রাবণ মৃত্যু তাঁর জোড়াসাঁকো বাড়িতে
কখনোই পারবো না মোরা এই কবিকে ভুলিতে।

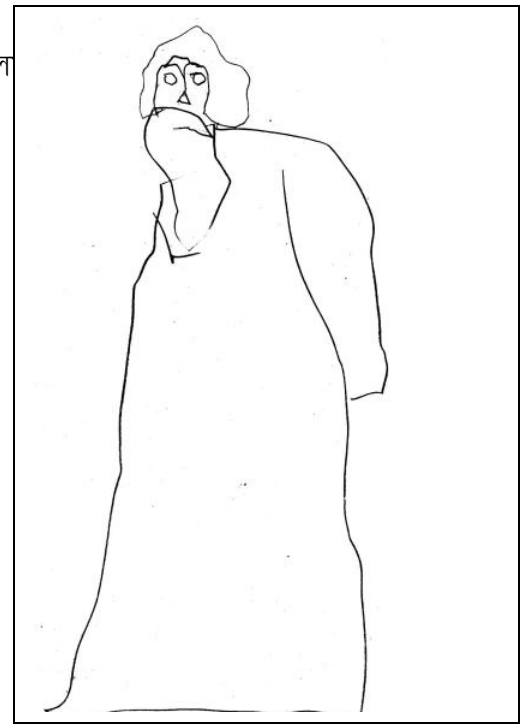

ছবি: ঋত্বিক

ভারতবর্ষ

সঞ্চারী ঘোষাল তৃতীয় শ্রেণী। নৈহাটি পুর বিদ্যালয়

দেশের নাম ভারতবর্ষ
আছে বিষাদ আছে হর্ষ
ভারতবাসী আমি
ভারতবাসী তুমি
ভারতই মোদের জন্মভূমি
বুকের মাঝে জয়ের আশা
হিন্দি মোদের রাষ্ট্রভাষা
তখনও ভারত হয়নি স্বাধীন
ছিলাম মোরা পরাধীন
ভারতবর্ষ স্বাধীন হল ঊনিশ শো সাতচল্লিশ সালে,
এতদিন ভারত বন্দি ছিল বৃটিশের মায়াজালে
প্রাণ ভরে ভারত মা'কে সেলাম জানাই
ভারত সুখে আছে দেখে মন ভরল তাই।

অনুবাদ গল্প

ভালো ডাইনি

ব্লেক লিন্টন উইলফং-এর 'দ্য গুড উইচ' অবলম্বনে

অনুবাদঃ মহাশ্বেতা

শিলা মার্শ তাঁর অফিস-ঘরে বসে রোগীদের রিপোর্টগুলো দেখছিলেন। এমন সময় ইন্টারকম বেজে উঠল। ফোনে রিসেপশনিস্ট বলল, ''ডক্টর মার্শ, একজন মিস্টার লুসিফার আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।''

শিলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ''ওনাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, আর, কেউ ফোনে আমায় চাইলে লাইন দিও না।''

পরমুহূর্তে বিজনেস সুট পড়া একজন লোক ঘরে ঢুকলো। ভালই লম্বা, গায়ের রঙ টকটকে লাল। সে তার টুপি ও রোদ-চশমা খুলতেই বেরিয়ে এল তার মাথার দুটো শিং, আর জ্বলন্ত দু-খানা চোখ। অন্ধকারের রাজপুত্র শিলার টেবিলের ওপর ঝুঁকে ভয়াল চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

''তুমি ঠিক কী করে চলেছ বলে তোমার মনে হয়?'', চেচিয়ে উঠল লুসিফার।

''আমি মার্শ পুণর্বাসন প্রকল্পের প্রেসিডেন্ট,'' শিলা শান্তভাবে উত্তর দিলেন, ''আপনার দেয়া 'বিদ্বেষ মন্ত্র' দিয়ে আমি আমার কাছে আসা নেশাগ্রস্ত লোকজনদের মধ্যে মাদকদ্রব্যের প্রতি বিদ্বেষ তৈরি করছি, তার ফলে তারা নেশা করা ছেড়ে দিচ্ছে। লাভের টাকা চ্যারিটিতে যাচ্ছে।''

''তুমি এসব করতে পারো না!'' শয়তান চিৎ কার করে উঠল, ''তুমি একটা ডাইনি। তোমার একটা ছুঁচলো টুপি পরে, ঝাঁটায় চড়ে ঘুরে বেরানোর কথা। আর এইরকম সৎ কর্মটর্ম করা তো একদমই উচিৎ নয়।''

''উফ! ভেবেচিন্তে কথা বলো। এটা বিংশ শতাব্দি। যে চুক্তিতে আমি সই করেছি, তাতে, এসব কাজের কোন উল্লেখ ছিল না,'' শিলা প্রতিবাদ করে উঠল।

শয়তান কোটের পকেট থেকে কয়েকটা কাগজ-পত্র বের করল। ''আমাদের চুক্তিতে কিন্তু খুব স্পষ্ট ভাবেই বলা আছে যে, এই একটা মন্ত্র ব্যবহার করতে থাকার বিনিময়ে, তুমি দুনিয়া জুড়ে অসন্তুষ্টি ও দু:খ ছড়াতে রাজি আছো!''

শিলা তার টেবিলের ড্রয়ার থেকে একখানা ফোল্ডার তুলে নিয়ে, শয়তানের মুখের সামনে তুলে ধরল, ''এতে সেই সব ডাক্তার ও ক্লিনিকদের ফোন নাম্বার রয়েছে যাদের কাছে মার্শ রিহ্যাবিলিটেশনে আসবার আগে আমার রোগীরা যেত। আমি হলফ করে বলতে পারি যে, এই লিস্টের প্রত্যেকটা লোককেই আমি দু:খ দিতে পেরেছি। তাদের কত ক্ষতি হয়েছে বলুন তো? আর যত সব মাদকদ্রব্যের ব্যাবসায়ী, আমার এইসব কার্যকলাপে তারা তো ভীষণ অসন্তুষ্ট।''

শয়তান যেন আরও একটু লাল হয়ে গেল। তারপর চুক্তির কাগজ-পত্রগুলো পকেটে রেখে দিয়ে নিচু গলায় বলে উঠল, ''তুমি নিজেকে খুব চালাক মনে করো, তাই না? আমি এই চুক্তি বদলাতে পারি না, কিন্তু তোমার ব্যাবহার করবার মন্ত্রটা নিশ্চয় বদলে দিতে পারি। অতএব আমি তোমার থেকে 'বিদ্বেষ মন্ত্র' ফেরত নিলাম আর তোমায় 'রোগের মন্ত্র' দিয়ে গেলাম। এই মন্ত্রের শব্দগুলো হচ্ছে, 'ইলারুগ্য অভাগারুণি' ''--এই বলে শয়তান একটা শয়তানি হাসি হাসল-- ''এবার দেখি, তুমি এই মন্ত্রটাকে দিয়ে লোকের ভালো কী করে কর!''

এই বলে শয়তান তার টুপি ও রোদচশমা পরে নিল। তারপর একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে চলে গেল।

কিছুকাল পরের কথা। শিলা মার্শ তাঁর অফিস-ঘরে বসে কিছু হিসেব-পত্র দেখছিলেন। এমন সময় ইন্টারকমটা বেজে উঠল। রিসেপশনিস্ট ফোনে বলল, ''ডক্টর মার্শ, একজন মিস্টার বিলজবাব এসেছেন। বেজায় তাড়া দিচ্ছেন, আ-আর খুব রেগে আছেন মনে হচ্ছে।''

শিলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ''ওনাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, আর কেউ ফোনে আমায় চাইলে এখন লাইন দিও না।''

অন্ধকারের রাজপুত্র রেগেমেগে শিলা মার্শ-এর ঘরে ঢুকে ধড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। এবার আর সে ছদ্মবেশ-টেশ পড়েনি: তার শিং-জোড়া, জ্বলন্ত চোখদুটো, আর দু-ভাগে চেরা লেজ সবই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। সে তার একটা খুড়ওয়ালা হাত দিয়ে টেবিলে একটা জোরদার চাপড় মেরে বলল, '' এ যাত্রায় এ'সব কী কান্ড করে বেড়াচ্ছ বল তো?''

''আমি মার্শ যাদু চিকিৎ সা ইনকর্পোরেট-এর প্রেসিডেন্ট,'' শিলা শান্তস্বরে উত্তর দিল। ''আমি আপনার দেওয়া 'রোগ মন্ত্র' দিয়ে রোগীর শরীরের জীবাণুদের অসুস্থ করে তুলি। আর তার

ফলে রোগীর নিজের শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা তাদের সহজেই হারিয়ে দিতে পারে। এটা অনেকটা এন্টিবায়োটিক-এর মতন, কিন্তু অনেক বেশি ফলদায়ক।''

শয়তান ভ্রূ কুঁচকে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, ''লাভের টাকা নিশ্চয়ই চ্যারিটিতে যায়। রোগীদের প্রাক্তন চিকিৎসক ও অনেক বড়ো বড়ো এন্টিবায়োটিক ব্যাবসায়ী তোমার কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট, তাই না?''

শিলা মাথা নেড়ে সোল্লাসে বলে উঠল, ''বা: বা: খুব ভালো! আপনি শিখছেন!''

''তুমি খুব চালাক, শিলা,'' অন্ধকারের রাজপুত্র বলল, ''কিন্তু আমার কাছে তুমি কিছুই নও। আমি তোমার 'রোগ মন্ত্র' ফেরৎ নিয়ে নিলাম আর তার বদলে তোমায় দিলাম 'ব্যাঙ-বানানোর মন্ত্র'। এই মন্ত্রের কথাগুলো হচ্ছে, 'বুফোনিস সাকারু'।'' এই বলে শয়তান তার শয়তানি হাসিটা হাসতে লাগল, ''এবার তুমি কী করবে শিলা মার্শ? এবার তো লোকজনদের ব্যাঙে রূপান্তরিত করা ছাড়া তুমি আর কিছুই করতে পারবে না। আমি বাজি ধরে বলতে পারি যে তুমি এই মন্ত্রটা দিয়ে করার মতো কোন ভালো কাজ পাবে না। হা: হা:!''

''ঠিক আছে,'' বলল শিলা। তারপর চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে শয়তানের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, ''বুফোনিস সাকারু।''

পুফ্ করে একটা শব্দ হল , তারপর দেখা গেল শয়তানের জায়গায় একটা অখুশি ও অসন্তুষ্ট ব্যাঙ বসে আছে।

শিং-ওয়ালা ব্যাঙ, অবশ্যই।

বৃষ্টি কেন হয়

অনুরাধা গুপ্ত

পাঁচ বছরের আয়ুষ খেলার মাঠ থেকে এসে ঠাম্মার কাছে জানতে চাইল, ''বৃষ্টি কেমন করে হয় বলোতো?''

ঠাম্মা কিছু মজার উত্তর আঁচ করে ওর কাছেই জানতে চাইলেন। বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে আয়ুষ বলে, ''তুমি জানো না। কিচ্ছু হবে না। আমি তোমায় বলে দিচ্ছি। সূর্য তো খুব গরম, তাই সেই তাপে নদী, পুকুর সুইমিং পুলের সব জল গরম হাওয়া হয়ে ওপরে উঠে যায়। আকাশ তো ঠাণ্ডা তাই জলওয়ালা গরম হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে মেঘ হয়ে যায় ও বাতাসে চড়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়। যখন খেলতে-খেলতে বা ঘুরতে-ঘুরতে দুটো মেঘে ঝগড়া হয়ে যায় তখন আমাদের পার্কের বন্ধুদের মতো মারামারি হয়ে যায়। যখন ওরা ঝগড়া করে আমাদের মায়ের মতো ওদের মা-ও গুম গুম গুড়ুম গুড়ুম করে বকেন। মেঘেদের মারামারির সময় যখন কারোর চোখে ব্যথা লেগে যায় তখন ও কাঁদতে থাকে। বন্ধুকে কাঁদতে দেখে যে মেরেছে সেই মেঘেরও খুব দু:খ হয়, সে-ও কাঁদে, আর আমরা ভাবি বৃষ্টি হচ্ছে।''

ঠাম্মা আর মা হাঁ করে আয়ুষের কথা শুনছিলেন, এর মধ্যে ওর আট বছরের দিদি নীহারিকা এসে জানতে চাইল, ''আমি কি ঠিক মতো ভাইকে বোঝাতে পেরেছি? কালই আমাদের ক্লাসে বৃষ্টির বিষয়ে ম্যাম বুঝিয়েছেন। সবটাতো ভাই বুঝবে না তাই এই গল্পটা বলেছি।''

''খুব ভালো হয়েছে,'' বলে ঠাম্মা দিদি ও ভাইকে দুই হাতে জড়িয়ে দুজনকে চুমু করলেন।

দারাঙ্গার মেঘ-পাহাড়

গৌরব রায়

দারাঙ্গার মেঘ, পাহাড় আর জঙ্গলই সব কিছু। জায়গাটা এক্কেবারে ভূটান সীমান্তে অসমের নলবাড়ি জেলার উত্তরপ্রান্তে। তরাইয়ের সবুজ ঘন জঙ্গল ছুঁয়ে চলে গেছে একে। পশ্চিমে বন্যপ্রাণী-সমৃদ্ধ মানস অভয়ারণ্য। এছাড়াও ছোটছোট কয়েকটা জঙ্গল রয়েছে আশপাশে। উত্তরে উন্নতশির গিরিরাজ হিমালয়ের চূড়াগুলো পূব থেকে পশ্চিমে সমান্তরাল ভাবে চলে গেছে। বর্ষাকালে বেজায় বৃষ্টি, শীতকালে প্রচন্ড শীত। বাদবাকি সময়গুলো অ বশ্য মনোরম।

আমাদের নীলিমাসি তখন ছোট ছোট দুটো ছেলেকে নিয়ে সেখানে থাকতেন। মেসোর সরকারি কোয়ার্টার। কোয়ার্টার বলতে দালান-কোঠা নয়, সার দিয়ে পরপর কিছু টিনের একতলা বাড়ি। টিনের দেয়াল, টিনের চাল, টিনের পার্টিশান, মেঝেটা কাঠের। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের আবাসন। এক একটা কোয়ার্টারের পর একটু ফাঁকা জমি, তারপর আরেকটা কোয়ার্টার। কোয়ার্টারগুলোর অবস্থান মাটি থেকে কিছুটা উঁচুতে। প্রত্যেকটা কোয়ার্টারের সামনে ও পিছনে কাঠের রেলিং দেওয়া দু'ফালি বারান্দা। সেখান থেকে দু'দিকেই কাঠের রেলিঙ লাগানো কাঠের সিঁড়ি নেমে এসেছে।। এসব করা হয়েছে বন্যা ও বন্য জন্তুর উৎ পাত থেকে রেহাই পেতে। স্থায়ী আবাসন তখন অবধি তৈরি হয়নি সে জায়গাটার ভূমিকমপ প্রবণতার কারণে।

কোয়ার্টারগুলোর পিছনে একটু তফাতে টিনে ঘেরা বাথরুম । সমগ্র আবাসনটা ঘিরে কাঁটাতারের বেড়া দিলেও মাঝে অনেক জায়গায় তার খুলে গেছে। আবাসনের মুখটায় একটা সেন্ট্রি পোস্ট ও কিছুটা দূরে তাদের কোয়ার্টার আছে। ওখানে সবসময় দু'জন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ান পাহারা দেয়। কুড়িটা কোয়ার্টার নিয়ে ছোট্ট আবাসন। মফস্বল শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত। কাছেই একটা প্রাথমিক স্কুল আছে, কিছুটা তফাতে বড় রাস্তার মোড়ে সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে। আছে একটা সাব পোস্ট অফিস। অন্যান্য প্রয়োজনে শহরে ঢুকতে হয়। বন্যা ও বন্যজন্তুর উপদ্রব এখানে লেগেই আছে। নিয়মিত অল্পসল্প ভূমিকমপ ও তার জেরে পুরো

আবাসনে ঝনঝনানির শব্দ এখানকার নিত্যসঙ্গী। আর আছে মশা, সাপ আর জোঁক। মাসিদের অ বশ্য এসব অভ্যেস হয় গেছে। কেবল ভূমিকমপ চলার সময় ওঁরা ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেন।

মেসোমশায় কেন্দ্রীয় সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে কাজ করেন। দারাঙ্গা থেকে তিব্বত ও পূর্ব ভূটানের সীমান্ত লাগোয়া অরুণাচল প্রদেশের টোয়ক-এ। জায়গাটা খুব দূরে নয় দারাঙ্গা থেকে, কিন্তু যাওয়া খুব ঝক্কি। যেতে হলে তেজপুর, বমডিলা, দিরাং হয়ে ঘুরে পাহাড়ি পথ দিয়ে যেতে হয়। মেসোমশায় মাসে একবার আসতে পারেন। কখনও তা-ও সম্ভব হয় না। ফোনে মাঝে মাঝে যোগাযোগ হয়। ফোনের লাইন বেশির ভাগ সময় খারাপ থাকে। বিদ্যুত আছে তবে তার অ বস্থাও তথৈবচ। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই থাকে না। এর মধ্যে ছোট দুই ছেলেকে নিয়ে নীলিমাসি কোনও রকমে দিন কাটান। সন্ধের পর সময় কাটানো আরও সাংঘাতিক। তখন টিভির চল হয়নি। তাছাড়া বেশিরভাগ সময় তো বিদ্যুত থাকে না। ঘরের ভেতরটা হ্যারিকেন জ্বলে। হ্যারিকেনের আলোর বৃত্তের বাইরে নি:ঝুম, নিস্তব্ধ, ঘুটঘুটে অন্ধকার। শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা ডাক। কাছের জঙ্গল থেকে মাঝে মাঝে শেয়ালের হুক্কা হুয়া। প্যাঁচা, হাটিটি, বার্কিং ডিয়ারের ডাক। দুরে অনেক সময় নেপালি বন বস্তি বা সাঁওতালদের বসতি থেকে গানবাজনার হালকা আওয়াজ শোনা যায়। অহমিয়া ও বোড়ো গ্রামগুলো একটু দূরে নামনি এলাকায়। মাঝখানে বাংলদেশের সিলেট-ময়মনসিংহ থেকে আসা বাঙালি মুসলমানদের বেশ কিছু বসতি গড়ে উঠেছে। সেগুলোও বেশ খানিকটা দূরে।

এই অঞ্চলে খুব হাতির উপদ্রব। মাঝে মাঝে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়ে বুনো হাতির দল এদিকটায় চলে আসে। আশপাশের গ্রামের কলাবাগান, বাঁশবাগান, ধানক্ষেত সব সাবড়ে দেয়। অনেক সময় ঘরবাড়ি ভেঙে দেয়, সামনে কেউ পড়লে বা বাধা দিতে এলে শুঁড়ে পেঁচিয়ে শূন্যে তুলে মাটিতে আছাড় মারে অথবা পা দিয়ে পিষে দেয়। বেশ কয়েক বার এই সরকারি আবাসনেও হামলা চালিয়েছে। আবাসিকদের কোনওরকমে প্রাণ হাতে পালাতে হয়েছে। প্রায়ই পার্শ্ববর্তী ধানক্ষেতে হরিণ ও সম্বররা চলে আসে। ফাঁদে ধরাও পড়ে। এছাড়াও মাঝেমাঝে বুনোশুয়োর, হনুমানের দল, ভাম বেড়াল ও সজারু চলে আসে। কখনও-সখনও চিতাবাঘ ও ভালুক।

যেদিনের কথা বলছি সেদিন তখন অনেক রাত। শীতের শুরু। কনকনে ঠান্ডা পড়েছে। বাইরেটা কুয়াশায় ঢাকা। নীলিমাসির ছোট ছেলে বাথরুমে যাবে। ওকে নিয়ে নীলিমাসি ঘর থেকে বারান্দায় বেরোলেন। বাইরেটা মিশমিশে অন্ধকার, ঠান্ডা ও কুয়াশায় মাখা। টর্চ আছে ঠিকই কিন্তু এই অবস্থায় কাঠের সিঁড়ি দিয়ে বাচ্চাকে বাইরের বাথরুমে নিয়ে যাওয়া খুব মুশকিল। তাই নীলিমাসি ওকে বারান্দার একটা কোণে নিয়ে গিয়ে কাজ সারলেন।

ঠিক তখনই খেয়াল হল, রাতের ঘন অন্ধকারের মধ্যে একদম সামনেই দুটো কালো, মস্ত বড় আর উঁচু কী জিনিস দাঁড়িয়ে! মেঘ, পাহাড় না জঙ্গল ? নীলিমাসি টর্চ জ্বালালেন। মেঘ-পাহাড়-জঙ্গল দুটো যেন একটু নড়ে উঠল, সেই সঙ্গে একটা ফোঁস করে নি:শ্বাসের শব্দ। নীলিমাসি শিউরে উঠলেন। আরে এ তো বিশাল চেহারার দু-দুটো হাতি একদম ওঁদের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে! আশেপাশে আরও অনেক হাতির নড়াচড়া টের পাওয়া যায়। জঙ্গল থেকে বুনোর পাল এসে ওঁদের আবাসন এলাকায় ঢুকে পড়েছে!

নীলিমাসি বুদ্ধিমতী মহিলা। ভয় পেলেও ঘাবড়ে গিয়ে বা চিৎকার চেঁচামেচি না করে দ্রুত টর্চ নিভিয়ে ছোট ছেলেকে নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ফোনে অন্য কোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলেন। কিন্তু লাইন খারাপ। ছোট দুটো ছেলে আর নেপালি কাজের মহিলা গভীর ঘুমে। ভঙ্গুর টিন-কাঠের বাড়ি। চারপাশ ঘিরে পাহাড়ের মত বুনো হাতির পাল। নীলিমাসি

জেগে বসে ভাবতে লাগলেন এই বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায়। কিন্তু অনেক ভেবেও কোনও কূল কিনারা করে উঠতে পারলেন না। এই হাতির দল অনায়াসে তাঁদের সহ বাড়িঘর তছনছ করে দিতে পারে। অন্যদিকে এই অন্ধকার রাতে ছোট দুটো বাচ্চা নিয়ে যাবেনই বা কোথায়, আর বেরোলেই তো হাতির পালের সামনে পড়তে হতে পারে। এইসব ভাবতে ভাবতে নীলিমাসি একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

নেপালী মহিলার ডাকে ঘুম ভাঙল। সকাল হয়ে গেছে। ছেলেরা তখনও ঘুমাচ্ছে। মহিলার পিছন পিছন বারান্দায় এসে দেখলেন বাড়ির আশপাশে হাতির টাটকা পায়ের ছাপ আর মলের স্তুপ কিন্তু ওরা নেই। দারাঙ্গার মেঘ-পাহাড় অন্ধকারে এসেছিল, অন্ধকারেই মিলিয়ে গেছে ফের।

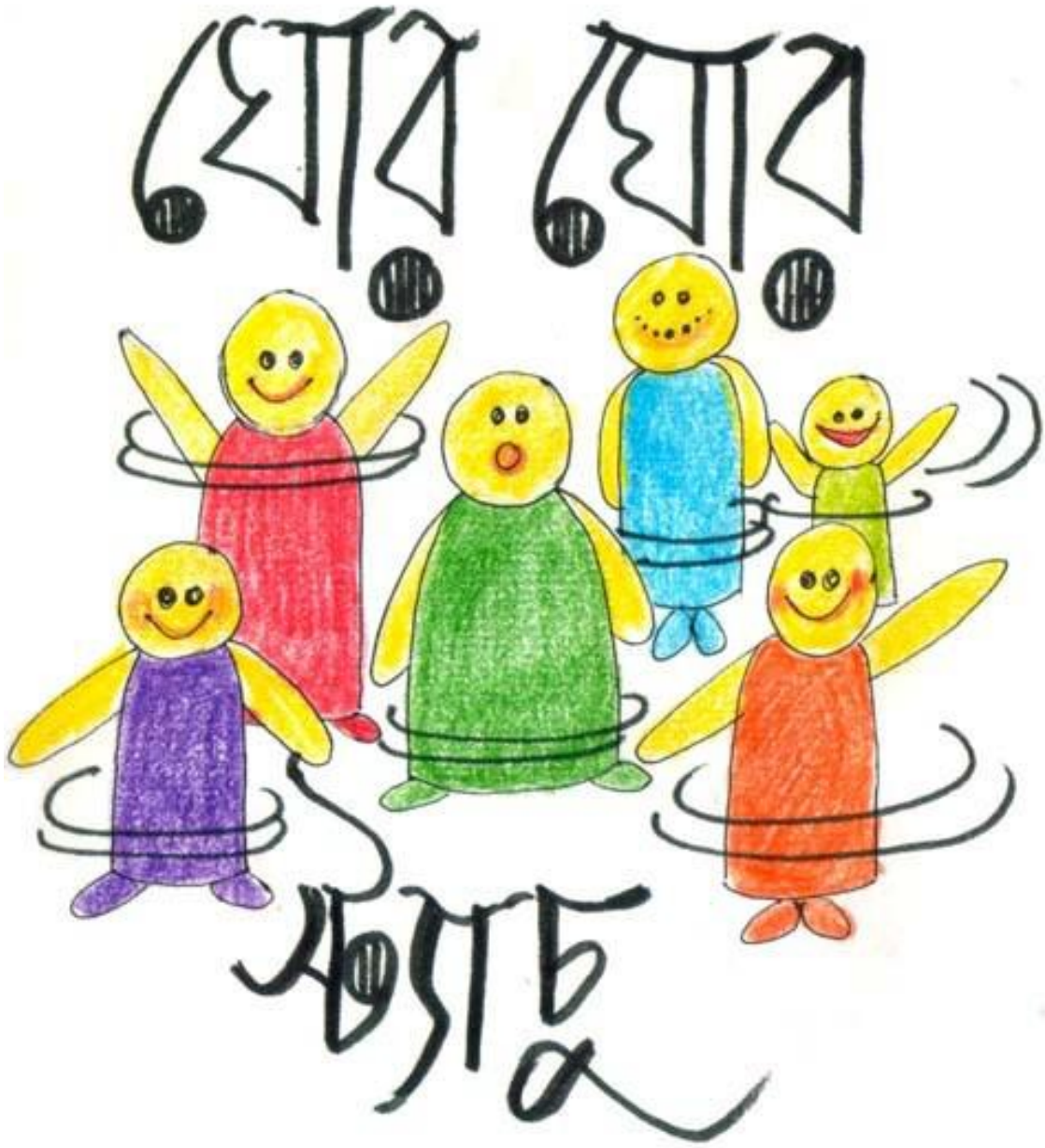

পার্থপ্রতিম পাল

ঘোর ঘোর ঘোর স্ট্যাচু-------

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। সকাল নটা নাগাদ হলদিবাড়ি এক্সপ্রেসে চেপেছে অনুপম। জানালার ধারে সিট। শরতের ঝলমলে আকাশ। ফুরফুরে বাতাস কখন ঘুম এনে দিয়েছে। টের পায়নি। এখন মাঝবেলা। যাবে কুমেদপুর। বহুদিন বাদে গ্রামে ফিরছে অনুপম। এক ঢোঁক জল খেয়ে বাইরে চোখ রাখে সে। একটু উদাস লাগছে। ওপরের শব্দগুলো ওর স্মৃতির পাতাগুলো

উল্টে দেয়। সেই কবে গ্রাম ছেড়েছে। পড়াশুনো বিশেষ কিছুই এগোয়নি। বাড়ির অবস্হা ভালো নয়। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেই কাজের সন্ধানে বেরোতে হয়েছে।

যিশুদার পাল্লায় পড়ে কোলকাতায় আসা, তা-ও হয়ে গেল কত বছর। অনুপম হিসেব করার চেষ্টা করে। একটা ছাপাখানায় কাজ করে অনুপম। পুরোনো কোলকাতার এক মহল্লায় একদল ভাড়াটের সাথে মাকে নিয়ে থাকে দেড়খানা ঘরে। বাবা মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর হল। চলে যাচ্ছে কোনমতে। লড়াইটা জারি রাখতে পেরেছে।

মনে পড়ে সত্যদার কথা। স্কুল মাঠে প্রতিদিন বিকেলে খেলাধুলোর পর সবে সন্ধ্যে নামছে। সত্যদা হাঁক দিচ্ছে- ঘোর ঘোর ঘোর স্ট্যাচু---। নটে,পাপাই,দিলু, পরী সবাই বিভিন্ন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ে। সত্যদা ঘুরে ঘুরে দেখে। কে কোন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। নড়বার জো নেই। সত্যদা অনুপমের সামনে এসে দাঁড়ায়। সে অপলক তাকিয়ে থাকে সত্যদার দিকে। বহুক্ষণ। ম শাগুলো কানের সামনে পোঁ পোঁ করতে থাকে।

অনুপমের বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। এখনো বিয়ে করেনি। দোহারা চেহারা। হাসিখুশি। তবু কোথায় যেন একটা বিষণ্ণতা ভেসে থাকে ওর দৃষ্টিতে। আপ্রাণ চেষ্টা করে লুকিয়ে রাখতে। কাজের ফাঁকে ছাপাখানায় বিভিন্ন পত্রিকা উল্টেপাল্টে দেখার অভ্যেস। হঠাৎ একদিন চোখ আটকে গেল একটা খবরে। একজন মানুষ স্রেফ স্ট্যাচু সেজে জীবনধারণ করছে।

ওইতেই মাথার মধ্যে চিন্তাটা খেলে গেল। ছাপাখানার কাজের ফাঁকে স্ট্যাচু হয়ে যদি কিছু বাড়তি রোজগার করা যায় ক্ষতি কী ! ছোটবেলায় স্কুলের মাঠে স্ট্যাচু হয়ে থাকতে পারতো অনেকক্ষণ। সত্যদা বাহবা দিত।

একটা নতুন লড়াইয়ের জায়গা তৈরি হয় অনুপমের। কঠিন সে লড়াই। প্রতিদিন ভাঙা-গড়া। প্রতিদিন মুখের ভাষা, চোখের ভাষা বদলে ফেলা। নিজের সঙ্গে লড়াইয়ে নামে সে। প্রতিদিন চলে স্ট্যাচুর চরিত্রের সাথে নিজেকে মানানসই করে তোলার সাজ। এইভাবেই একদিন রামকৃষ্ণ সেজে স্ট্যাচু হয়ে চমকে দিয়েছিলো কোলকাতার চালপট্টির এক পুজো প্যান্ডেলে। তারপর থেকে চলছে নিজেকে ভাঙাগড়া। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্ট্যাচু হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা।

গাড়ি কুমেদপুর যখন পৌঁছলো তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। গত কয়েকদিন এখানে বৃষ্টি হয়েছে। একটা রিকশা ডেকে বাক্সটাকে তুলে নিয়ে উঠে বসল সে।

কুমেদপুর সার্বজনীনের এবার সুবর্ণজয়ন্তী। তাই ডাক পড়েছে তার। ষষ্ঠী থেকে নবমী এই চারদিন স্ট্যাচু হয়ে থাকতে হবে মন্ডপে। বেশ কয়েকদিন ধরে প্রচারও চলছে। একটা চাপা উৎ সাহ এলাকার মানুষের মধ্যে।

শরিকি বাড়ির অনুপমদের অংশটা দেখভাল করে দূর সমপর্কের হারুকাকা। অনুপম আসবে জেনে সব গোছগাছ করে রেখেছে। বাড়িতে এসে জ্যাঠা-কাকাদের সাথে গল্প করতে করতে অনেকদিন পর কাছে পাওয়া মাটির গন্ধ অনুপমকে আচ্ছন্ন করে। সন্ধ্য হতে সে বেরিয়ে পড়ল পাড়ায়। অনেককিছু বদলে গেছে। চারপাশে একটা পুজো পুজো আমেজ। নিশিকান্তের চায়ের দোকানে দেখা পাপাই দিলুদের সঙ্গে। সবাই বেজায় খুশি, বহুদিন বাদে দেখা।

'আরে অনুপম যে! আয় আয়। নিশিদা একটা চা বাড়িয়ে দাও,' কথাটা বলতে বলতে পাপাই জড়িয়ে ধরে অনুপমকে। পরী ছিল একটু দূরে। প্রথমটা খেয়াল করেনি।

'তারপর, বল কেমন আছিস?'

'বেশ ভালো। অনুপম উত্তর দেয়।'

এইভাবে শুরু করে আড্ডা জমে যায় এক সময়। রাত দশটার পর বাড়ি ফেরে অনুপম। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো পড়েছে বিছানায়। অনুপমের চোখের এককোণে জল স্হির হয়ে থাকে।

ষষ্ঠীর ঝলমলে আকাশ। দূরে মাঠের এককোণে কাশফুল দোল খাচ্ছে। হাল্কা শিউলির গন্ধ অনুপমকে ছেলেবেলায় নিয়ে যায়। বাড়ি ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ে সে। মাটি হারানোর একটা চাপা যন্ত্র ণা অনুভব করে। অনুপম হাঁটতে থাকে। দুপাশের গাছগাছালিকে জড়িয়ে ধরতে চায়। হাঁটতে হাঁটতেই ভাবতে থাকে আজ কী সাজবে সে। মহান মানুষের স্ট্যাচু হওয়াটাই রেওয়াজ। রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, নেতাজি-এই সন মহান মানুষের সাজই সে সাজে সাধারণত।

হঠাৎ বিজনবাবুর মুখটা ভেসে ওঠে। কুমেদপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। প্রায় এক হাতে স্কুলটাকে দাঁড় করিয়েছেন। এই এলাকার শিক্ষার চালচিত্রটাই বদলে দিয়েছিলেন এই মানুষটি, একেবারে একক চেষ্টায়। এলাকার মানুষজনের অসম্ভব শ্রদ্ধা এই মানুষটার প্রতি।

অনুপমের মনে হ'ল গতানুগতিকতা থেকে বেড়িয়ে একটু অন্যরকম সাজা যাক। কত স্মৃতি তাঁকে ঘিরে। খুব রাশভারি মানুষ ছিলেন। কোনদিন সাহস হয়নি বিজনবাবুর সামনে দাঁড়ানোর। এমনিই তাঁর ব্যক্তিত্ব। অথচ মনটা শিশুর মত সরল। মারা গেছেন বহুদিন হল। মনে পড়ে বিজনবাবুর শেষ যাত্রায় গোটা কুমেদপুর ভেঙে পড়েছিলো। অনুপম মনস্থির করে নেয়। না, রামকৃষ্ণ , বিবেকানন্দ নয়, আজকে বিজনবাবু হয়েই সে মন্ডপে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়াবে।

সন্ধ্যে হতেই মন্ডপে ভিড় উপচে পড়েছে। মাইকে ঘোষণা চলছে। মন্ডপের একপাশে নির্দিষ্ট জায়গায় অনুপম দাঁড়িয়ে পড়ে। ধুতি পাঞ্জাবী পরা, কাঁচা-পাকা চুল। কালো ফ্রেমের মোটা চশমা। বাঁ হাতে ঘড়ি। একটু ঝুঁকে একটা ছড়ির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। ডান হাতের ওপর বাঁ হাত। দৃষ্টি সামনে। অনুপম মন:সংযোগ করতে থাকে। ধীরে ধীরে মাইকের আওয়াজ অস্পষ্ট হয়। ক্রমশ অনুপম বিজনবাবুতে বদলে যায়।

মন্ডপ দেখতে এসে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ছে। অবাক বিস্ময়ে বিজনবাবুকে দেখছে। কেউ কেউ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। কেউ কেউ প্রণাম করছে শ্রদ্ধা ভরে।

হঠাৎ অনুপম একটা অস্বস্তি বোধ করে। বুকের মধ্যে একটা মোচড় দিয়ে ওঠে। একটা যন্ত্র ণা। আর সেই যন্ত্রণা পেতে পেতে সে উপলব্ধি করে বিজনবাবু যেন আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছেন তার দেহ ছেড়ে। অনুপম পাথরের মত নিথর হয়ে থাকে।

বিজনবাবু আস্তে আস্তে মণ্ডপ ছাড়িয়ে রাস্তার উপর উঠে আসেন। তাঁর হাতে গড়া স্কুলের দিকে পা বাড়ান। রাস্তা সোজা গিয়ে বাঁ-দিকে মোড় নিয়েছে। সেখানেই বাঁ-হাতে কুমেদপুর হাইস্কুল। বিজনবাবু এগোন। একটা রোমাঞ্চ তাঁর মন জুড়ে।

বিরাট গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি তাকিয়ে থাকেন স্কুলটার দিকে। হালকা হাওয়ায় গাছগুলো নড়ে ওঠে। যেন তাঁকে স্বাগত জানায়। দু-চারটে শিউলি পায়ের কাছে ঝরে পড়ে। তাঁরই হাতে লাগানো গাছটা আজ কত বড় হয়ে গেছে। বিজনবাবুকে আচ্ছন্ন করে রাখে অনেক পুরোন সব স্মৃতি। সবকিছু সেই একই রকম আছে- বকুল গাছের বেদি, অফিসরুম। গেটের থেকে স্পষ্ট দেখতে পান। তিলে তিলে গড়া সেই ছোট্ট কুমেদপুর হাইস্কুল এখন অনেক বড়। গ্রিলের ঠান্ডা ছোঁয়ায় বিজনবাবুর মনটা জুড়োয়। একটা গর্ব অনুভব করেন।

দূরে একটা আলো জ্বলছে। স্কুলের মাঠ পেরিয়ে, ঘোষেদের পুকুর পেরিয়ে একটা ছোট্ট বাড়ি। আলো সেইখান থেকেই আসছে। হঠাৎ বিজনবাবুর মুখটা শুকিয়ে যায়। মাথা নিচু করে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর আলোর দিকে এগোন। বিজনবাবুর মন চলে যায় অতীতের দিকে। সেদিন টিফিন পিরিয়ড চলছে। অফিসে তাঁর টেবিলে একমনে কি একটা কাজে ডুবে ছিলেন

বিজনবাবু। সকাল থেকেই কোন কারণে বিভ্রান্ত লাগছিলো তাঁর। টিফিন খাননি এখনো। হঠাৎ ক্লাস এইটের রতন এসে বলল অয়ন তার টিফিন খেয়ে নিয়েছে।

প্রতিদিন অয়ন কোন না কোন কান্ড বাঁধাবেই। ডানপিটে, দুরন্ত, কাউকে তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না। অন্য মাস্টারমশাইরাও প্রতিদিন ওর নামে নানা অভিযোগ করছেন। বিজনবাবু জেরবার। তবু তাঁর স্বভাব-সুলভ ভঙ্গিতে তাঁদের বলেন, 'ছেলেমানুষ দুরন্ত তো হবেই। দেখবেন ও ঠিক হয়ে যাবে।' স্যারেরা অবশ্য এইসব কথায় খুব একটা সন্তুষ্ট হন না। তবু বিজনবাবুর মুখের উপর কথা বলার সাহস কারো নেই।

অথচ সেদিন কী যে হল! রতনের কথা শুনেই বিজনবাবু অয়নকে ডেকে পাঠালেন। দপ্তরি হীরেনদা গিয়ে অয়নকে ধরে নিয়ে এল।

বিজনবাবুর হাতে সব সময় একটা ছড়ি থাকতো। অথচ কেউ কোনদিন সেটি তাঁকে ব্যবহার করতে দেখেনি। ক্লাসে যাবার সময়, স্কুলে রাউন্ড দেবার সময় ঐ ছড়িটা থাকবেই থাকবে। চশমা, ঘড়ির মত ছড়িটাও বিজনবাবুর সর্বক্ষণের সঙ্গী।

ছড়িটা উঁচিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন অয়নকে, 'তুই রতনের টিফিন খেয়েছিস?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'আমার খুব খিদে পেয়েছিলো তাই।'

কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল কে জানে! হঠাৎ প্রচন্ড হুংকারে বিজনবাবু ঝাঁপিয়ে পড়লেন অয়নের ওপর। হাতে, পায়ে, পিঠে সপাটে চলতে লাগলো ছড়ির আঘাত। অন্যান্য স্যারেরা এসে পড়েছেন কিন্তু কেউ কিছু করতে সাহস পাচ্ছেন না। বিজনবাবুর রুদ্র মুর্তি দেখে টিফিন শেষ হবার আগেই ছাত্ররা যে যার ক্লাসে ফিরে গেছে। দরজা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করছে।

বিজনবাবু যখন থামলেন অয়ন তখন কুঁকড়ে একতাল মাংস পিন্ডের মত একটা থাম ধরে কাঁপছে। ছড়িটা মাঠে ছুঁড়ে ফেলে অফিসরুমে গিয়ে চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা রাখলেন তিনি। ঐ দিনের পর তাকে কেউ কখনো ছড়ি হাতে দেখেনি।

বিজনবাবুর মনে পড়ে, এরপর টানা তিনদিন অয়ন ইস্কুলে আসেনি। জ্বর হয়েছিলো। যখন এলো, অয়ন তখন অন্যরকম। ডানপিটে, দুরন্ত অয়ন কেমন যেন শান্ত সমুদ্রের মত। সেদিনের পর তিনি অয়নের মুখোমুখি হতে পারেননি।

বিজনবাবু প্রায় বাড়িটার দোরগোড়ায় এসে পড়েছেন। নজরে পড়ে কতগুলো কচিকাঁচাদের ভিড়। সেদিনের বালক অয়ন আজ মধ্যবয়সী যুবক। অয়ন এখন একটা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। কাছের ভক্তিপুর গ্রামে। অবসর রেলবস্তির ছেলেমেয়েদের বিনেপয়সায় পড়ায় সে।

একচিলতে বারান্দায় মাদুর পেতে পড়াচ্ছে অয়ন। আর বারবার ছাত্রদের বলছে, 'তাড়াতাড়ি করো। এরপর সবাই মিলে মন্ডপে যাবো।' কচিকাঁচাদের উৎসাহ বাড়ে তাই শুনে।

আর একটু এগোন বিজনবাবু। হঠাৎ নজর যায় বারান্দার দেওয়ালে।সযত্নে টাঙানো তাঁর-ই একটা ছবি। পাশে ঝুলছে তাঁর সেদিনকার ফেলে দেওয়া সেই ছড়ি।

বিজনবাবুর বুকের ভেতর থেকে অনেকদিনের চাপা একটা কান্না বেড়িয়ে আসতে চায়। উজজ্বল শিক্ষকজীবনের মধ্যে সেই একটা দিনই কেবল ভীষণ কালো। ভীষণ অন্যায় করেছিলেন তিনি সেদিন। সেই কাঁটা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বয়ে বেড়িয়েছেন। অথচ সুযোগ ছিলো। অয়নকে একটু কাছে টেনে আদর করলেই---- কিন্তু পারেননি। কোথায় যেন আটকে গিয়েছিলেন। হয়ত চাপা আত্মগরিমা। কিন্তু আজ যেন কোন কিছুই বাঁধ মানছে না। বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। চোখে জল। বিজনবাবু অয়নের পিঠে বাঁ হাতটা রাখতে যান।

হঠাৎ একটা তীব্র উত্তাপ অনুভব করেন বিজনবাবু। তার বাঁ হাতটা যেন পুড়ে যাচ্ছে। অসহ্য জ্বালা। চিৎকার করতে গিয়েও থমকে যান তিনি। একটা অস্পষ্ট আওয়াজ ক্রমশ জোরালো হয়ে ওঠে কানের ভেতর। ঘোর ঘোর ঘোর স্ট্যাচু------।

অনুপম দেখে একজন মধ্যবয়সী যুবক, জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরেছে তার বাঁ হাতের উপর। স্ট্যাচুর পরীক্ষা চলছে। কিন্তু নড়লে চলবে না। বিজনবাবুর মূর্তিকে হাসির খোরাক হতে দিতে পারবেনা তাঁর ছাত্র অনুপম। অতএব তার চোখের জল চোখেই স্হির হয়ে যায়। তীব্র যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে সে কেবল শুনতে পায়, সত্যদা ক্রমাগত চিৎকার করে যাচ্ছে- ঘোর ঘোর ঘোর স্ট্যাচু।

খেপি

অনন্যা দাশ

চিঙ্কিকে ওর বাবা আর দাদা আদর করে খেপি বলে ডাকে। ছোটবেলা থেকেই তার একটা একরোখা জেদ আছে। ওর মাথায় যা ঢুকবে সেটা বার করা খুব কঠিন। খুব ছোট বেলায় ওর ম াথায় কে একটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে পাউরুটিতে নাকি ভূত থাকে। ব্যাস তারপর থেকে আর চিঙ্কিকে পাউরুটি খাওয়ায় কার সাধ্য!

চকোলেট খেলে দাঁতে পোকা হয় শুনে চিঙ্কি চকোলেট খাওয়া ছাড়ল। বাবার বস্ ওদের বাড়িতে খেতে এসে ওর জন্য চকোলেট এনে মহা বিপদে পড়ে গেলেন। চিঙ্কি সে চকোলেট তো নিলই না উল্টে বাবার বস্ যতক্ষণ ওদের বাড়িতে থাকলেন ততক্ষণ চিঙ্কি চকোলেটের পিন্ডি চটকে ছাড়ল। বাবার তো কি অপ্রস্তুত অবস্হা! বস্ ভদ্রলোক অবশ্য কিছু মনে করেননি। চিঙ্কির কথা শুনে বলেছিলেন,''বাবা! এতটুকু মেয়ের এত বুদ্ধি! আমার মেয়েটার যদি এত কান্ডজ্ঞান থাকত তাহলে আমাকে ওর দাঁতের পিছনে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালতে হতনা!'' ভদ্রলোক চকোলেটটা ফেরৎ নিয়ে গিয়ে চিঙ্কির জন্যে একটা দামি ইংরাজি বই পাঠিয়েছিলেন বাবার হাতে। ঘটনাটার জন্যে মা বাবার কাছে প্রচন্ড বকুনি খেয়েছিল সে কিন্তু তাকে দমানো যায়নি!

ইদানিং ওকে একটা নতুন নেশায় পেয়েছে। সায়েন্সের নতুন দিদিমনি দুটো ক্লাস নেওয়ার পর থেকেই চিঙ্কি নাকি ওর দাদার ভাষায় 'জল পুলিশ' হয়ে গেছে! পৃথিবী নাকি রসাতলে যাচ্ছে, উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুর বরফ সব গলে যাচ্ছে আর পৃথিবীকে বাঁচানোর সব দায়িত্ব চিঙ্কির ঘাড়ে! প্রথম শুরু হল দাদাকে দিয়েই। বেসিনের কলটা খুলেই দাঁত মাজছিল সে। হঠাৎ পিলে চমকানি একটা চিৎকার শুনে ব্রাশ ফেলে মাজন গিলে একাকার কান্ড। সিংহের শিকারের উপর ঝাঁপানোর মতন করে ঝাঁপিয়ে পড়ে কলটা বন্ধ করে দিল চিঙ্কি। দাদা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জিজ্ঞেস করল, ''কীরে কী হয়েছে? অমন বিকট চিৎ কার কেন?''

চিঙ্কি কটমট করে ওর দিকে চেয়ে বলল, ''জল নষ্ট করা কত বড় অপরাধ জানিস না? এবার থেকে কল বন্ধ করে দাঁত মাজবি!'' সেই থেকেই দাদা ওর নাম 'জল পুলিশ' দিয়ে দিল।

চিঙ্কির নতুন খামখেয়ালিপনার জেরে বাড়ির কারো শান্তিতে তিষ্ঠোনোর জো নেই!

বাবা টিভিতে টেস্টম্যাচ দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন আর শুরু হয়ে গেল চিঙ্কির চিৎকার,'' টিভি না দেখলে অফ করে দিতে হবে, না হলে বিদ্যুৎ নষ্ট হচ্ছে।''

বাবা প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলেন, ''আমি তো দেখছি।''

''ইস, নাক ডাকিয়ে ঘুম হচ্ছে! আমি যেন দেখতে পাই না! তোমাদের মতন লোকেদের জন্যে মালদ্বীপ জলের তলায় চলে যাচ্ছে!''

বাবা ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, ''যা! অমনি সব দোষ আমার হয়ে গেল?''

''হলই তো!''

মাকেও ছাড়ছে না চিঙ্কি। প্রচন্ড গরম বলে মা একটা ঘরে এসি লাগিয়েছেন কিন্তু চিঙ্কির জ্বালায় সেটা চালানো কি যায়! এসি চলতে দেখলেই বলবে, ''গরম সহ্য কর, গরম সহ্য কর। এসি চালিও না। এনার্জি নষ্ট হয়ে শেষ হয়ে যাবে। গ্রিন হাউস এফেক্টে সব বরফ গলে গেলে পৃথিবীর অর্ধেক জলের তলায় চলে যাবে!''

ফ্রিজের দরজা খুলে রাখা যাবে না। ঘর থেকে বেরোলেই আলো নিভিয়ে যেতে হবে। এমন সব অনেক কিছু করতে চেষ্টা করল চিঙ্কি। মা বাবা কখনও বোঝেন আবার কখনও রেগে যান।

দাদা সবসময় এটা ওটা নাম ধরে খেপায় কিন্তু চিঙ্কি থামবার পাত্র নয়। সে আর দাদা এখন হেঁটে স্কুলে যায় আসে। পেট্রল নষ্ট করা মোটেই চলবে না।

এইরকমভাবেই চলছিল, এমনসময় একদিন প্রবল কালবৈশাখিতে পাড়ার খেলার মাঠের বেশ কিছু গাছ পড়ে গেল। দাদার সাথে স্কুল থেকে ফেরার সময় চিঙ্কি দেখল অবশিষ্ট গাছগুলো কাটা হচ্ছে। সে অমনি সেখানে গিয়ে হাজির। ''কি ব্যাপার? গাছ কাটছ কেন?''

''সব গাছ কেটে ফেলতে হবে গো দিদিমনি। এখানে বড় বাড়ি হবে!''

চিঙ্কি রেগে গেল, ''বাড়ি হবে মানে? এটা তো খেলার মাঠ? দোলনা, স্লিপ রয়েছে দেখছো না?''

''তা তো দেখছি কিন্তু গাছ পড়ে অনেক কিছুই ভেঙে গেছে তাই আমাদের গাছ কাটতে বলা হয়েছে। এখানে বাড়ি তৈরি হবে।''

''যাও তোমরা এক্ষুণি যাও! না হলে পুলিশ ডাকবো! যাও বলছি!'' বলে চিঙ্কি চিৎ কার করে বলতে লাগল,''গাছ যে কাটতে নেই তাও জান না? পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলে বাড়ি করে কী হবে শুনি আর তোমরাই বা কোথায় থাকবে?''

লোকগুলো চিঙ্কির চিৎ কারে আস্তে আস্তে সরে গেল। আশেপাশের বেশ কিছু লোক জড় হয়ে মজা দেখছিল। তাদের একজন চিঙ্কির দাদাকে বলল, ''জমিটা আগে শেঠ যমুনাদাসের ছিল। উনি জমিতে পার্ক করতে দিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে যমুনাদাসজি মারা গেছেন তাই ওনার ছেলে জমিটার উপর বাড়ি করতে চাইছেন।''

দাদা বাড়িতে এসে মা বাবাকে ঘটনাটা বলতে বলতে বলল, ''চিৎকারের তো নানান লেভেল আছে! চিঙ্কির চিৎকার লেভেল ওয়ান টুর ধার ধারে না! একেবারে অ্যাডভানসড্ লেভেলের চিৎ কার! লোকগুলো চিৎকারের ঠেলায় পালালো!''

বাবার ভ্রু কুঁচকে গেল , শেঠ যমুনাদাস তো বিশাল বড়লোক ছিলেন। সারা শহরে ওনার অসংখ্য জায়গায় বাড়ি আর জমি ছিল। ওনার ছেলেদের এইরকম মতিভ্রম হল কেন কে জানে।''

পরদিন বিকেলবেলা শেঠ যমুনাদাসের ছেলে রতনলাল চিঙ্কিদের বাড়ি এসে হাজির। বাবাকে কীসব বোঝাতে গেলেন। বললেন,''আমরা চারভাই দুই বোন। বাবা মারা যাওয়ার পর এই পার্কটা আমার ভাগে পড়েছে। ঝড়ে সব দোলনা স্লিপ নষ্ট হয়ে গেছে তাই আমি ঠিক করলাম ওখানে একটা বহুতল বাড়ি তৈরি করে দেবো। আবাসনের যা সমস্যা শহরে তা তো আপনি জানেনই!''

বাবা মাথা নেড়ে বললেন, ''আমাকে বুঝিয়ে কোন লাভ নেই। আপনার লোকেদের যে তাড়িয়েছে তাকে বোঝানো একটু মুশকিল আছে।বড্ড জেদি মেয়ে!'' বলে 'খেপি, খেপি' বলে

ডাক দিলেন। চিঙ্কি এল। বাবাটাও যেন কেমন! বাইরের লোকের সামনেও ওকে খেপি বলে ডাকছেন! চিঙ্কি নামটা মনে রাখাটা কি এত শক্ত?

''ইনি শেঠ যমুনাদাসজির ছেলে রতনলালজি। এনার লোকেদেরই তুমি কাল তাড়িয়ে দিয়েছিলে। উনি তোমার সাথে একটু কথা বলতে চান।''

রতনলালজি চিঙ্কিকে বললেন, ''তোমার নাম কী খুকুমণি?''

খুকুমণি শুনে চিঙ্কি বিরক্ত হয়ে বলল,''আমার ভাল নাম চিত্রিতা, ডাক নাম চিঙ্কি।''

''তোমাদের জন্যে তো একটু দূরে একটা পার্ক আছে আর সেটা বড় পার্ক তাই আমি ভেবেছিলাম এই পার্কটা বদলে ওখানটায় বাড়ি করলে অনেক লোক থাকতে পারবে। তা তুমি আমার লোকেদের পুলিশের ভয় দেখিয়েছো বলে ওরা কাজে আসতে চাইল না আজ। তুমি যদি কথা দাও---''

''বেশ করেছি ভয় দেখিয়েছি।'' ওনার কথা শেষ হওয়ার আগেই চিঙ্কি বলে উঠল, ''বড় পার্ক অনেক দূরে। আমরা এখানেই খেলি। আর তাছাড়া গাছ কাটলে পৃথিবী ধবংস হলে আপনি কোথায় যাবেন শুনি?''

রতনলালজি অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু চিঙ্কিকে বোঝাতে পারলেন না। শেষে যাওয়ার সময় রেগে বাবাকে হুমকি দিয়ে গেলেন, ''আপনার মেয়েকে সামলে রাখবেন!''

পরদিন স্কুল যাওয়ার পথে চিঙ্কি দেখল গাছ কাটার লোকজন আবার এসেছে। স্কুলে গিয়ে

সায়েন্সের টিচারকে সব বলল চিঙ্কি। উনি শুনে বললেন, ''ঠিক আছে, আমাদেরই কিছু করতে হবে! দাঁড়াও, প্রিন্সিপালকে জিজ্ঞেস করে আসি!''

এরপরে যেটা ঘটল সেটা অভূতপূর্ব। টিভিতে দেখিয়েছিল। তোমরা দেখেছিলে কিনা জানিনা। সানশাইন স্কুলের সব ছেলেমেয়েরা পার্ক নষ্ট করে ফেলার জন্যে পার্কের জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেছিল লাঞ্চের সময়। মুখ্যমন্ত্রী আর প্রধানমন্ত্রীকে চিঠিও লিখেছিল সবাই। শেষপর্যন্ত সরকার থেকে জমিটা পার্কের জন্য কিনে নতুন দোলনা, স্লিপ সব লাগানো হয়েছে তবে তার আগে অনেক জলঘোলা হয়েছিল। চিঙ্কির অবশ্য সে সব নিয়ে ভ্রুক্ষেপ নেই। সে রাতারাতি সেলিব্রিটি হয়ে গেছে। ওর কচি মুখে 'পৃথিবী বাঁচাও' ভাষণ শুনতে ফাংশানে, টিভিতে, রেডিওতে সবাই ওকে ডাকে।

গরমের ছুটিতে আমেরিকাতে অনুষ্ঠিত 'হাউ টু সেভ দি আর্থ অ্যান্ড মেক ইট আ বেটার প্লেস' কনফারেন্সে যাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছে চিঙ্কি। মা, বাবা আর দাদাও যাচ্ছে ওর সাথে। মা-বাবা তো ভীষণ খুশি। দাদাও খুশি কিন্তু বেশ ভয়ে রয়েছে। বিদেশ থেকে আরো না জানি কী কী সব কিম্ভূত ধারণা মাথায় করে নিয়ে আসবে চিঙ্কি, আর সেগুলোর প্রয়োগ তো সবার আগে ওর উপরই হবে!

কাই-এর কথা

চিঙ্কুমরী সিংহ

আজ কী হয়েছে জান?

যখন খালপাড় দিয়ে সকালে অফিস যাচ্ছিলাম তখন দেখি যে শরৎ আবাসন ব্লকের একটা পার্কে বসে তকাই দোল খাচ্ছে দোলনায়। তকাই-কে চিনতে পারলে না? আরে হযবরল-এর হিজিবিজবিজকে মনে কর; তকাই তার মামা অথবা কাকা; আসলে তকাই বলে ডাকলে, হিজিবিজবিজের মামা আর কাকা একজায়গায় থাকলে কে সাড়া দেয় সেটাই আমার কৌতুহল। তকাই বলে ডাকলে বোঝা যায় কী করে যে আসলে কাকে দরকার - কাকাকে না মামাকে? তকাই-কে দেখে কৌতুহল নিরসনের সুযোগ হাতছাড়া করতে ইচ্ছে হল না। এক লাফ দিলাম রিকশা থেকে; পৌঁছে গেলাম পার্কে।

তকাই-এর সামনে গিয়ে বললাম, ''হাই তকাই, আমাকে বলতে পার------- '' তকাই হো হো করে হেসে বলল ''বোসো।'' হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল পাশের ফাঁকা দোলনাটা। বসলাম। অমনি পৌঁছে গেলাম আমদের উড়িয়াপাড়ার বাড়িতে। সেখানে তখন খুব হই হই কাণ্ড চলছে। আমার বোনঝি ইমলি, যে গান গায়, ছবি আঁকে, ইস্কুলে যায়, সে হঠাৎ রূপাই-এর হামা দেওয়া পুতুলটার মত এক বিঘৎ হয়ে গেছে; মাথায় চুল নেই; মুখের মধ্যে দুটো দাঁত; তার ওপর একটা গোলাপি রঙের কেশর লাগানো গোলাপি চামড়ার সিংহের মুখোশ পরে হামা দিচ্ছে।

চমকে গেছিলাম ওই চেহারা দেখে। একটু সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে ফেললাম, '' ইমলি, সোনালি সিংহ গোলাপি হল কি করে?'' ইমলি খুব গম্ভীর হয়ে বলল, ''ভ্যানিলা আইসক্রিম খেতে গিয়েছিলম, খেয়াল ছিল না তো যে আমি খুব ছোট্ট হয়ে গেছি; ব্লকটায় কামড় দিতে গিয়ে পুরো ম ুখটাই ডুবে গিয়েছিল ভ্যানিলা আইসক্রিমের ব্লকের মধ্যে; তাতেই আইসক্রিম মুখে আর কেশরে ম াখামাখি হয়ে গোলাপি রঙ নিয়েছে।''

এদিকে ইমলির মা ইমলিকে খুঁজছেন ইস্কুলে পাঠাবেন বলে। আর ইমলি কেবল এই খাটের তলায়, সেই টেবিলের তলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার সঙ্গে খিল খিল করে হাসছে। তার এই দুষ্টুমিতে রেগে গিয়ে ইমলির মা বেগুনি বর্ণ নিলেন। তারপর যেই ইস্কুলে যাওয়ার ভ্যানরিকশা এল, অমনি বেড়াতে যাওয়ার লোভে তাতে ইমলি চড়ে বসল। আর রিকশাওয়ালা ভজাকাকু ইমলিকে গ্রেপ্তার করে তুলে দিলেন ওর মায়ের হাতে।

তারপরে এক বিষম যুদ্ধ বেধে গেল। ইমলিকে মা জামা পরাতে যান তো ইমলি জামার হাতার মধ্যে দিয়ে গলে যায়; জুতো পরাতে যান তো ইমলি জুতোর ভেতরে লুকিয়ে পড়ে; খাটের

ওপর জুতোটা খুব জোরে ঝাড়তে থাকেন ইমলির দাদু। একসময় থপ করে জুতোর মধ্যে থেকে ইমলি পড়ে খাটের ওপর। অমনি মা বাঁ হাত দিয়ে খপ করে মুঠোয় ধরে ফেলেন ইমলিকে। তাঁর ডান হাতে ধরা ছিল বাড়ির সব থেকে ছোট আর সরু চিরুনিটা। সেটা দিয়ে যেই না ইমলির মাথা আঁচড়াতে গেছেন অমনি কেশরের ভ্যানিলা আইসক্রিম সব চিরুনিতে গেছে জড়িয়ে। টানাটানিতে ইমলি জোরে চেঁচিয়ে ওঠে। দাদু মাকে ধমকে ওঠেন ইমলিকে ব্যথা দেওয়ার জন্য। দু:খে মা কাঁদতে বসেন। এই ফাঁকে ছাড়া পেয়ে ইমলি আবার খেলায় মাতে। ভজাকাকু ইমলিকে ছাড়াই রওয়ানা হয়ে যান ইস্কুলের দিকে।

খানিক পরে ইমলির বাড়ি আসে রুপাই। ইমলিকে গোল টেবিলের তলা থেকে কুড়িয়ে নেয়। তারপরে যেই ইমলির পায়ের দম ফুটোতে চাবি ঘুরিয়ে দম দিতে শুরু করে রুপাই, অমনি একটু একটু করে বাড়তে শুরু করে ইমলি। সব দেখে শুনে মায়ের কান্না যায় থেমে। প্রথমে তাঁর মুখ রাজভোগের মাপে হাঁ হয়ে ওঠে, তারপর রাগে তামার মত লাল হয়ে ওঠেন। তৎ-ক্ষণাৎ রুপাই-এর হাত থেকে চাবিটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেন মা।

চাবিটা কোথায় গিয়ে পড়ল ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে গেলাম যেই পাশ থেকে তকাই বলে উঠলো, '' যা:, চাবিটা যে খালের জলে পড়ল; আর তো কোনদিন ইমলি ছোট হতে পারবে না।''

আমি ভাবছিলাম যদি চুনো মাছ ধরা জালে চাবিটা আটকায়, তাহলে ওটা ফেরত পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেই কথাটাও তকাই টের পেয়ে গেল; বলল , ''ধুৎ, খালে জল কই? শুধু পাঁক আর পাঁক। চাবি ডুবে পাঁকে গেঁথে গেছে, ও আর পাওয়া যাবে না।''

এ কথা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তার ধাক্কায় ঘাসের মাথা থেকে এক ঝাঁক গঙ্গাফড়িং উড়ে গেল ফড়ফড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তকাই উঠে পড়ে দোলনা ছেড়ে। আমি জিজ্ঞেস করি, ''কোথায় চললে?''

হন হন করে এগিয়ে যেতে যেতে তকাই মুখ ফিরিয়ে উত্তর দেয়, '' কাকের সাথে দেখা করার কথা ছিল আমার। তোমার ইমলির পাল্লায় পড়ে আমি সেটা ভুলে গেছিলাম।''

আমি ফের প্রশ্ন করি,'' কাকের সাথে তোমার এত কী জরুরি দরকার?''

আরও দুর থেকে তকাই উত্তর দেয় , '' এখানে একটা জায়গায় কয়েকটা হরিণ থাকে, বনে না থেকে মানুষের সাথে থাকে বলে ওরা ছাগলের মত ডাকে। কাক আমাকে সেই হরিণ দেখাতে আর তাদের ছাগল ডাক শোনাতে নিয়ে যাবে বলে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে। জোরে পা চালিয়ে যেতে হবে ভাই, না হলে আবার কাকেশ্বর সুদ শুদ্ধু সময় ফেরত চাইবে। আসি ভাই।''

তকাই একটা কুম্ভী গাছের মাথায় মিলিয়ে গেল। আমি আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছি। শুনতে পেলাম রিকশাওয়ালা বলছে '' দিদিভাই, আমার ভাড়াটা?''

রিকশাভাড়া মিটিয়ে অফিসে ঢুকলাম। সামনেই দীনবন্ধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। অভ্যেসবশে জিজ্ঞেস করলাম, '' কোন ফোন এসেছিল?''

দীনবন্ধু জোর হেসে বলল, '' আপনার ছাড়া আর কোন ফোন আসে নি তো।''

আমি বেশ অবাক হলাম; বলেই ফেললাম, '' আমি আবার ফোন করলাম কখন!''

দীনবন্ধু বলল, '' এই তো মিনিট দশেক আগে। আপনি বলছিলেন না যে ফোনটা হরিণের খাঁচায় নিয়ে গিয়ে শোনাতে ওরা কেমন ছাগলের মত ডাকছে .....''

আরও অবাক হয়ে যাই; বলেই ফেলি, '' সত্যি কি ওরা ছাগলের মত ডাকছে নাকি?''

দীনবন্ধু হো হো করে হেসে ওঠে; বলে, '' চিতল হরিণকে তো কখনও ডাকতেই শুনি নি।''

জাতক কথা

সর্বংদ্রষ্ট জাতক

নন্দিনী

সে অনেকদিন আগেকার কথা।বারাণসীতে তখন রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। সেইসময় একজন্মে বোধিসত্ব ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত হিসাবে জন্মেছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ। সমস্ত রকম শাস্ত্র তো তিনি জানতেনই,তা ছাড়াও একটা বিশেষ মন্ত্র তাঁর জানা ছিল---জয় মন্ত্র---যার সাহায্যে পৃথিবীও জয় করা যায়। এ এমনই এক মন্ত্র যে বিশেষ ধরণের আচার অনুষ্ঠান না করে উচ্চারণ করলে মহা অনর্থ হতো।

তখনকার দিনে বইপত্র ছিলনা। মানুষকে সবকিছুই মনে করে রাখতে হোতো। তাই একদিন বোধিসত্ব একটা নির্জন জায়গা দেখে সেই মন্ত্রটা আবৃত্তি করলেন। কারণ মাঝে মাঝে চর্চা না করলে ভুলে যাবেন যে! মন্ত্রটা আবৃত্তি করে তাঁর নিজেরই খুব ভাল লাগল। তিনি নিজের মনেই বললেন, 'নাঃ, মন্ত্রটা আমি ভালই রপ্ত করেছি, এখনো কেমন সুন্দর আবৃত্তি করতে পারছি।' তাঁর মুখের কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, এক শেয়ালপণ্ডিত গর্ত থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'শুধু তুমিই নয় হে, আমিও ভালই মুখস্ত করেছি----হেঁ----হেঁ----হেঁ---' বলেই দৌড় মারল জঙ্গলের দিকে।

'ওরে , কে কোথায় আছিস, ধর,ধর শেয়ালটাকে------' বলতে বলতে বোধিসত্ব দৌড়লেন শেয়ালের পিছনে। আর ধর ধর, তিনি নাগাল পাওয়ার আগেই শেয়াল জঙ্গলের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। বোধিসত্ব কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে ফিরে এলেন রাজপুরীতে।

এদিকে শেয়াল কী করল? সে এক ছুটে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে সামনেই এক শেয়ালনীকে দেখতে পেল। তার গায়ে এক কামড় বসিয়ে বেশ গ্রামভারী চালে বলল, ' জানিস আমি কে?'

শেয়ালনী শেয়ালের রকমসকমে একটু ঘাবড়েই গেল। ভাবল, না জানি কোন বীরপুরুষ এসেছেন! কী দরকার বাবা এঁকে ঘাঁটিয়ে? তাই সে একটু ভয়ে ভয়েই বলল, 'না প্রভু, আপনাকে জানার সৌভাগ্য আমার হয়নি।'

'তবে দেখ আমি কে।'

বলেই শেয়াল মহা আড়ম্বড়ে সেই মন্ত্র আবৃত্তি করতেই জঙ্গলের সমস্ত বাঘ, সিংহ, হাতী থেকে শুরু করে যতরকম পশুপাখি ছিল,শেয়ালের সামনে এসে সবাই মাথা নীচু করে দাঁড়াল। শেয়াল তখন দুখানা হাতীর পিঠে একটা সিংহকে চড়িয়ে তার পিঠে নিজে চড়ে বসে বলল, 'শোনো, আজ থেকে আমিই তোমাদের রাজা।' মন্ত্রের এমনই প্রভাব যে বাঘ, সিংহ সবাই বিনা বাক্যে শেয়ালকে রাজা বলে মেনে নিল।

শেয়াল রাজা হয়ে সকলের উপরে প্রভুত্ব করতে লাগল। সে নাম নিল সর্বংদ্রষ্ট। এক সুন্দরী শেয়ালনীকে বিয়ে করে তাকে মহারানির পদ দিল।

এরপর থেকে শেয়ালরাজা যখনই তাঁর রাজত্ব পরিদর্শনে যেত তখনই হাতী, হাতীর পিঠে সিংহ , তার পিঠে নিজে মহারানিকে নিয়ে চড়ত।

ক্রমে শেয়ালের মধ্যে ক্ষমতার গর্ব দেখা দিল। সে ভাবতে লাগল,আমি পৃথিবী জয়ের মন্ত্র জানি, তাহলে আমি মানুষের চেয়ে কম কীসে? কালই আমি বারাণসীতে গিয়ে মানুষগুলোকে হঠিয়ে দিয়ে রাজ্য জয় করব।যেই ভাবা সেই কাজ। শেয়াল পরদিন সকালেই সমস্ত পশুদের জড়ো করে

জোড়া হাতীর পিঠে সিংহকে চাপিয়ে, তার পিঠে নিজে চড়ে চলল যুদ্ধযাত্রায়। রাজধানীর প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে রাজাকে খবর পাঠালো ,'হয় রাজ্য দাও , নয়তো যুদ্ধ করো।'

অতগুলো বাঘ, সিংহকে একসঙ্গে দেখে রাজ্যের সবাই ভয় পেয়ে গেল। রাজামশাই সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলেন রাজ্যের সব কটা ফটক বন্ধ করতে। তারপর তিনি জরুরি সভা ডাকলেন। বাঘ ,সিংহের সঙ্গে লড়াই তো সোজা কথা নয়। সেনাপতি মস্ত বীর। কিন্তু তিনি তো মানুষের সাথে লড়বার কৌশল জানেন। সবাই ম াথা নীচু করে ভাবতে লাগল কী করা যায়? এমনসময়ে বোধিসত্ত্ব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমিই রাজ্যের হয়ে লড়াই করব, আপনারা কোনো চিন্তা করবেন না।'

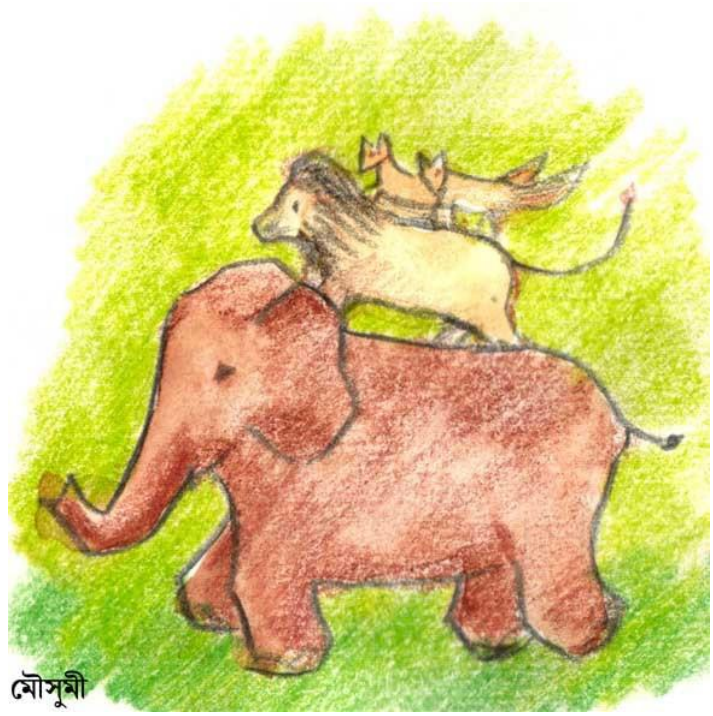

তাই শুনে রাজা, মন্ত্রী, উজির, নাজির মায় প্রহরী পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে গেল। বলে কী ঠাকুরমশাই! পাঁজিপুঁথি নিয়ে যাঁর কারবার তিনি করবেন বাঘ,সিংগির সঙ্গে যুদ্ধ? নির্ঘাত ঠাকুরমশাইয়ের মাথাটি বিগড়েছে।

উপস্থিত সকলের মুখের ভাব দেখে পণ্ডিতমশাই বুঝতে পারলেন সবই। বললেন,'আমি সব দিক ভেবেই বলছি--এ লড়াই জিততে হলে অন্য কৌশল করতে হবে, আর সেটা আমি ছাড়া কেউ জানেনা।'

বোধিসত্ত্ব সবাইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে গিয়ে চড়লেন একেবারে সিং-দরজার মাথায়। চেঁচিয়ে বললেন,'কী হে সর্বংদ্রষ্ট, কীভাবে রাজ্য জয় করবে ঠিক করলে হে?'

'সে আর এমন কী কঠিন কাজ? আমার সিংহেরা যদি একবার গর্জন করে তাহলেই তো তোমরা ভয়েই আধমরা হয়ে যাবে। তারপর তোমাদের শেষ করতে কতক্ষণ? সে তো একটা বাচ্চা শেয়ালও পারবে।'

বোধিসত্ত্ব তখন ভেরি বাজিয়ে সবাইকে কানে তুলো গুঁজতে বললেন। বললেন,কুকুর বেড়াল-ও যেন বাদ না থাকে।

সবাই তাই করল.।

বোধিসত্ত্ব আবারও উঠলেন ফটকচূড়ায়।বললেন, 'কী হে ,নতুন কিছু ভাবলে নাকি?'

'না, না ঠাকুর। তোমাকে তো তখনই বললাম--আমার সিংহের দল গর্জন করলেই তো কাজ সারা হয়ে যাবে ,আবার নতুন কী ভাবব?'

'দেখ, এরা আবার তোমার মত একজন শেয়ালের কথা শোনে কিনা। যতই নিজেকে রাজা বলনা কেন, আসল পশুরাজ তো সিংহ,সে কথা সবাই জানে। আর অন্যদের কথা ছেড়ে দাও,তোমার বাহন তোমার কথা শোনে কিনা দেখ।'

একথা শুনে শেয়ালের খুব রাগ হোলো।সে সঙ্গে সঙ্গে তার বাহনকে গর্জন করতে বলল। সিংহটা তখন হাতী দুটোর কানের কাছে মুখ নিয়ে তিনটে প্রবল হুংকার ছাড়ল। আর যেইনা গর্জন করা, হাতীগুলো প্রচণ্ড ভয় পেয়ে লাফালাফি জুড়ে দিল । ফলে শেয়ালশুদ্ধ সিংহ পড়ল গিয়ে একেবারে হাতীর পায়ের সামনে। আর হাতীর পায়ের নীচে শেয়ালের মুণ্ডু পিষে যেতে দেরি হোলোনা। পশুর দল তখন প্রাণের ভয়ে লেজ তুলে দৌড়োল জঙ্গলের দিকে।

বোধিসত্ত্ব শিষ্যদের এই গল্প বলে বললেন,'ক্ষমতার গর্বে অন্ধ হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করলে তার পরিণতি শেয়ালের মতই হয়।'

১। সেলসম্যানের বিপদ

'অমলিন' কোমপানির ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের সেলসম্যান একটা বাড়ির কলিং বেল টিপতে এক মহিলা এসে দরজা খুললেন। সেলসম্যান একটা থলি থেকে খানিকটা পচা গোবর বের করে মেঝের কার্পেটের ওপরে ঢেলে দিল তারপর একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার বের করে সেটার প্লাগ , দেয়ালের সুইচবোর্ডের একটা প্লাগ পয়েন্টে গুঁজতে গুঁজতে বলল, 'আগামি দু মিনিটের মধ্যে আমাদের কোমপানির ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে যদি আপনার কার্পেটের গোবর পরিষ্কার করে দিতে না পারি ম্যাডাম, তাহলে এই গোবর আমি চেটে খাবো, চ্যালেঞ্জ নিচ্ছি।'

মহিলা নরম গলায় প্রশ্ন করলেন, ' সঙ্গে একটু সস দেবো কি? অথবা কেচাপ?'

'কেন ম্যাডাম?' সেলসম্যান বিহ্বল গলায় প্রশ্ন করল।

'কারণ আমাদের মেন সুইচ উড়ে গেছে। মিস্তিরি আসবে দুঘন্টা পরে।'

২। প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: ১। এককথায় প্রকাশ করো-- 'একটি শশা + দুইটি শশা = তিনটি শশা'

২। দুই কথায় প্রকাশ করো-- ''একটি শশা + দুইটি শশা = সাড়ে তিনটি শশা'

উত্তর: ১। শশাংক ২। ভুল শশাংক

খেলার রাজা পর্বতারোহণ

বাসব চট্টোপাধ্যায়

অটো লকিং

বিলে প্লেট

ফিগার অব এইট

টিউব্যুলার

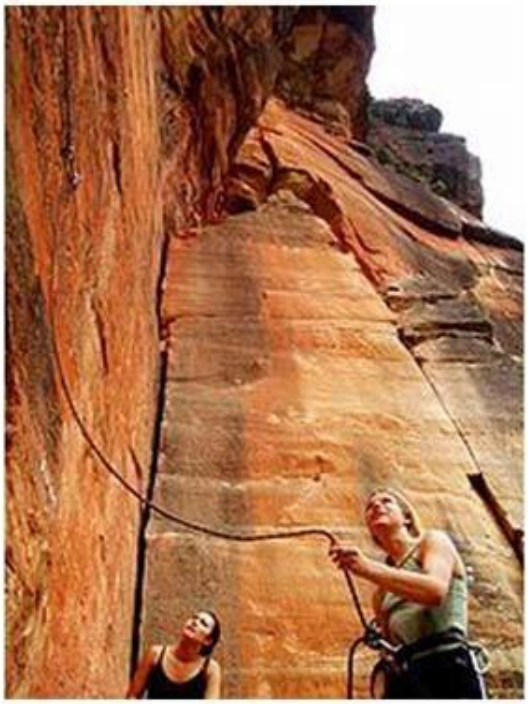

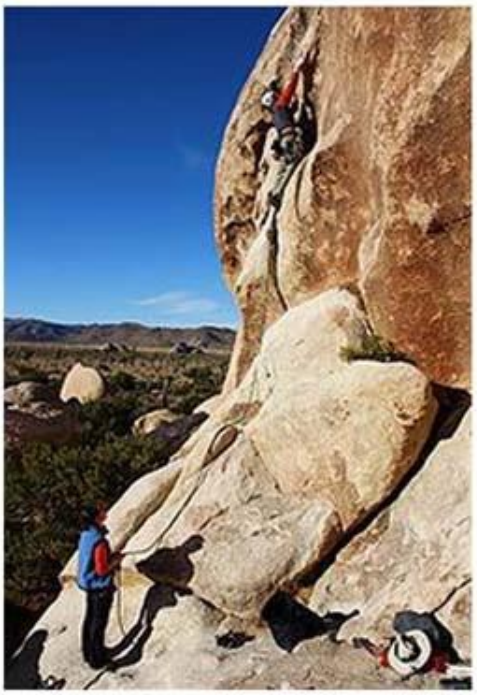

বিলে করা হচ্ছে

সেল্ফ বিলে ডিভাইস

গ্রিগরি

রিভার্সো

শৈলারোহণের প্রাথমিক ধারণা দেবার সময় ছোটো ছোটো পাথরে খালি হাতে পায়ে (দড়ি ছাড়া) আরোহণ শেখানো হয়। একে শৈলারোহণের পরিভাষায় বোল্ডারিং বলা হয়। বোল্ডারিং অভ্যাস করলে আরোহীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে। ফলে যখন উচুঁ রকফেস আরোহণের প্রয়োজন তখন তার ভয় করে না।

কিন্তু তখন আর খালি হাত পায়ে আরোহণ করা যায় না, তাতে বিপদ হতে পারে। তাই দড়ির সাহায্যে আরোহণ করা হয়।

কিন্তু দড়িকে কিভাবে ব্যবহার করবো? ফ্রি হ্যান্ড ক্লাইম্বিং শেখানোর পর আরোহী শিক্ষার্থীকে 'বিলে' করা শেখানো হয়। এইবার জানতে হবে 'বিলে' কাকে বলে? কঠিন রকফেসে আরোহীর হঠাৎ পতন রোধ এবং আরোহীকে কঠিন পথ আরোহণে সাহায্য করে দড়ি। সেই দড়িকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যবহার করে আরোহীর পক্ষেশৈলারোহণ সম্ভব হয়।

একজন আরোহী এবং বিলে সাহায্যকারীর মধ্যে দড়ি টানটান থাকা উচিৎ। যাতে যে কোন পতনজনিত টান আরোহী এবং বিলেকারীর মধ্যে না পড়ে।

এইবার জানতে হবে বিলে কতরকমের হয়।

বিলে সাধারণত তিন প্রকার:

১) স্পাইক (২) থ্রেড (৩)আরটিফিসিয়াল বা কৃত্রিম বিলে।

প্রথম একজন বিলেকারী দড়িটিকে কোন শক্ত গাছ অথবা বড় পাথরের খুঁটির সাহায্যে নিজেকে দৃঢ়বদ্ধ করে আটকে নেবে। একে বলে অ্যাংকারিং। বিলেকারী নিজেকে অ্যাংকারিং করার পরে অন্য একটি দড়ি কোমরে গোল করে ঘুরিয়ে অন্যপ্রান্ত আরোহীকে দেবে কোমরে বাঁধার জন্য। আরোহী কোমরে দড়ি বেঁধে আরোহণ শুরু করলে পতন জনিত যেকোন বাধা অ্যাংকারিং এর জন্য বিলেকারী সামলাতে পারবে।

স্পাইক বিলে: শিলাগাত্রে সুদৃঢ় ও গজালের মত পাথরের অংশকে স্পাইক বলে। দড়ি অথবা স্লিং স্পাইকের ওপর দিয়ে জড়িয়ে যে বিলে করা হয় তাকে স্পাইক বিলে বলা হয়।

ক্লাইম্বিং রোপ দিয়ে স্পাইক বিলে করাতে হলে বিলেকারীর কোমরের দিকে দড়ি গোল (লুপ) করে স্পাইকের ওপর দিয়ে রেখে 'বো-লাইন নট' (বিভিন্ন নট-এর ব্যাপারে জনতে আগের সংখ্যা দেখো) লাগিয়ে নিতে হবে। তারপর দুটো বা তিনটে থাম্ব নট দেওয়া দরকার।

থ্রেড বিলে: রকফেসের ফাটলের ভিতরের গর্ত দিয়ে স্লিং ঘুরিয়ে তাতে ক্যারাবিনার লাগিয়ে কোমরে জড়ানো দড়ির সঙ্গে ক্লিপিং করা হয়। এই বিলে সব থেকে নিরাপদ। কারণ স্পাইক বিলে পাথর থেকে উপড়ে আসার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু পাথরের সৃষ্ট স্বাভাবিক গর্তে সেই সম্ভাবনা থাকে না। তাতে যত ওজনই বহন করা হোক।

আর্টিফিসিয়াল বিলে-র মধ্যে নিচের পদ্ধতিগুলো আসবে–

হিপ বিলে: হিপ বিলে প্রথম আরোহীকে সাহায্য করার জন্য ব্যবহৃত হয় না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় আরোহীকে আরোহণে সাহায্য করা হয় এই বিলে দিয়ে। একে ওয়েইস্ট বিলেও বলা হয়। আরোহীর কোমর দিয়ে দড়ি ঘুরিয়ে দুহাতের শক্ত মুঠোয় ধরা হয়। যেদিকে আরোহীর দড়ি ছাড়া হয় তার বিপরীত হাতে দড়ি একটা পাক দিয়ে নিতে হয়। ফলে দড়ি হাত ফসকে বিপদ ঘটাতে পারে না । আরোহীর পুরো ভার বিলেকারীর কোমরের ওপর থাকে। হিপ বিলে করার সময় কোমরের ওয়েস্ট ব্যান্ড জামা এবং সোয়েটার দিয়ে ঢেকে নিতে হয়। কারণ নাইলনের বিলে রোপের সাথে ওয়েস্ট ব্যান্ডের ঘর্ষণে ওয়েস্ট ব্যান্ড গলে যেতে পারে।

রানিং বিলে:- সাধারণত: প্রথম আরোহীর পতনজনিত আঘাত এড়াবার জন্য রানিং বিলে করা হয়। রানিং সাধারনত: ১০ ফুট অন্তর লাগানো উচিৎ। প্রথম আরোহীর পতন হলে সে সাধারণত: ১০ফুট নীচেই ঝুলে পড়বে, তাতে আঘাত লাগার সম্ভাবনাও কমবে। কিন্তু রানারের দূরত্ব বেড়ে গেলে আরোহীর আঘাত লাগবার সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে। উচ্চ পাথরের খাঁজ, ওভারহ্যাং এবং ট্র্যাভার্স করার সময় রানিং বিলে বিশেষ কার্যকরী। স্পাইক অথবা থ্রেড বিলেতে অসুবিধা হলে পিটনের সাহায্যে অ্যাংকার করে স্লিং ও ক্যারাবিনার দিয়ে রানিং বিলে করা যায়। আরোহীর কোমরের

দড়ি শুধু রানিং বিলের কারাবিনারে লাগিয়ে নিতে হবে।

এতক্ষণে নিশ্চই বোঝা যাচ্ছে যে আরোহীর নিরাপত্তার জন্য দড়ির গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে 'বিলেয়ার' এর প্রয়োজন। এই নিয়ন্ত্রণের কাজ সহজতর করা সম্ভব হয় অধুনা আবিষ্কৃত নানা ধরনের বিলে যন্ত্রের সাহায্যে।

যদি কখনো আরোহীর পতন হয় তখন বিলে যন্ত্রের সাহায্যে আরোহীর পতন রোধ করা অনেক সহজ হয়। সুতরাং আরোহীর নিরাপত্তা যেহেতু বিলেকারীর উপর নির্ভর করে সেই জন্য যন্ত্রের ব্যবহার যথাযথভাবে জেনে নেওয়া জরুরি।

এবার বিভিন্ন ধরণের বিলে ডিভাইস এবং তাদের ব্যবহার সমপর্কে আলোচনা করবো।

টিউবিউলার: এই যন্ত্রটির দুটি ছিদ্র থাকে যেখান দিয়ে দড়িকে পাস করানো যায়। ভীষণই হালকা এবং সহজে ব্যবহার করা যায়।

ফিগার অফ এইট :ইংরেজি আট সংখ্যার মত দেখতে এই যন্ত্রটি আরোহীকে বিলে এবং অবরোহণ অর্থাৎ র‍্যাপেলিং এ কাজে লাগে। যন্ত্রটিতে এমনভাবে দড়ির ফাঁস দেওয়া হয় যাতে পতন ও অবরোহণের সময় যদি কোন কারণে আরোহীর পতন ঘটে তবে দড়িটি ফিগার অব এইট এর মধ্যে দিয়ে দ্রুত চলাচল করতে পারে তো নাই উল্টে শক্তভাবে দড়ি যন্ত্রের মধ্যে আটকে যায়, এবং আরোহী বা অবরোহী ইচ্ছামত দড়িকে নিজের সুবিধামত ব্যবহার করতে পারে।

বিলে প্লেট:টিউবিউলার যন্ত্র আসার পর এটির এখন ব্যবহার হয় না। এরও দুটি ছিদ্র থাকে, যেখান দিয়ে দুটি দড়িকে পাস করিয়ে খুব ভালোভাবে বিলে করা যায়।

অটোলকিং: এই ধরণের যন্ত্রের কার্যপদ্ধতি অনেকটা মোটর গাড়ির সিটবেল্টের মত কাজ করে, অর্থাৎ আকস্মিক দড়ির ধাক্কায় বিলেকারী যদি আরোহীর পতনরোধে ব্যর্থ হয়, তবে এই যন্ত্রটি শক্তভাবে দড়ির গতিকে রদ্ধ করে এবং দূর্ঘটনা থেকে আরোহীকে রক্ষা করে। এছাড়াও নিত্যনতুন পরীক্ষা নিরিক্ষার মাধ্যমে আরো নানা ধরণের আধুনিক বিলে যন্ত্র পাওয়া যাচ্ছে। যেমন রিভার্সো, গ্রিগরি।

সমপ্রতি একক পর্বতারোহীদের কথা মাথায় রেখে আর এক ধরণের অত্যাধুনিক বিলে যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তার নাম সেল্ফ বিলে ডিভাইস। আরোহী আরোহণের পূর্বে এই যন্ত্রটিকে স্হাপিত করে আরোহণ শুরু করে। যদি কোন কারণে পতন হয়, এবং পতনের ফলে অতিরিক্ত দড়ির চাপ যন্ত্রটিতে পড়ে, তবে এটি আপনা থেকে গতিকে রুদ্ধ করে দেয়। কিন্তু পুনরায় আরোহণ করতে চাইলে মসৃণভাবে দড়িটি যন্ত্রটির মধ্যে দিয়ে চলতে পারে।

এবার এইটুকুই। পরের সংখ্যায় আরোহণ অবরোহণের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং পবর্তারোহণে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নিয়ে আলোচনা করবো।

ক্রমশ

লোককথা

সোনা সোনা

দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

সে এক মস্ত পাহাড়। তার নাম কানালি। সেই পাহাড়ে ঘর বেঁধে থাকত দুই ভাই। তারা বনে বনে শিকার করে, সন্ধেবেলা ঘরে ফেরে, শিকারের চামড়া ছাড়ায়, আগুন জ্বালায়,ঝলসিয়ে খায়, তারপর নাক ডেকে ঘুমায়, সকালে ঘুম থেকে উঠে আবার শিকারে যায়। এমনি করে দিন কাটে, মাস কাটে, দু ভাই মহা সুখে থাকে, শত্তুরের কলজে ফাটে।

একদিন হল কি, বনের ভেতর সন্ধে বেলা ফাঁদ পেতেছিল দু ভাই।সকালবেলা গিয়ে দেখে ফাঁদে এক হরিণ পড়েছে।সেতো যে সে হরিণ নয়, তার সোনার মত গায়ের রং, রানির মত চলার ঢং।ফাঁদ থেকে তুলে এনে কাটতে যাবে, তখন মানুষের গলায় হরিণ বললে-- ‘ আমায় মেরে তোমরা আমার মাংস খাবে তো , তা খেয়ো।তবে কি না, পিলে আর পিত্তির থলেটা খেওনা যেন, ওদুটোকে নতুন হাঁড়িতে রেখে, নতুন কাপড়ে ঢেকে,ঘরের চালে লটকে রেখো একরাত। সকালবেলা তোমাদের বরাত খুলে যাবে।’

কথা মত হরিণের পিলে আর পিত্তির থলিটা হাঁড়িতে ভরে ঘরের চাল থেকে লটকে রেখেছিল দু ভাই। সকালে উঠে দেখে, মস্ত বড় এক চাঙড় সোনা পড়ে আছে সেই হাঁড়িতে। তাই থেকে খানিক খানিক সোনা বেচে বেচে দু ভাই বিরাট বড়লোক হয়ে গেল।

শেষে কি হল বলি শোন। অ----নেক দিন বেঁচে থাকবার পর,যেই না দু ভাই স্বর্গে যাওয়া, ওমনি তাদের সোনা বোঝাই হাঁড়ি তলিয়ে গেল মাটির অনেক তলায়। মাটিতে খনি খুঁড়ে সেই সোনা আজও তুলে আনে মানুষ, আর তাই দিয়ে গয়না গড়ে গায়ে পরে।

(কোরাপুট জেলার কোন্দ দোরা উপজাতির গল্প)

ছবি : মৌসুমী

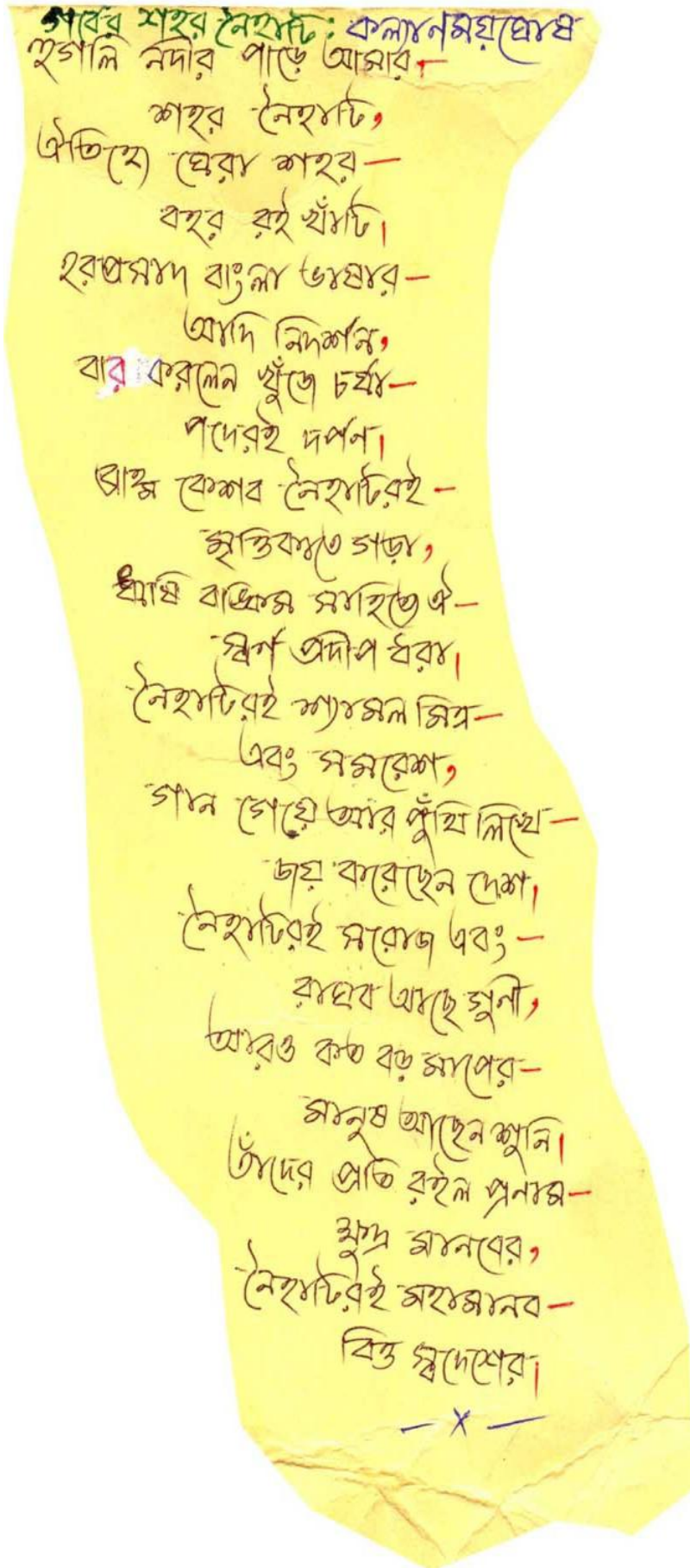

সবার শহর নৈহাটি : কল্যাণময় ঘোষ

হুগলি নদীর পাড়ে আমার —
শহর নৈহাটি,
ঐতিহ্যে ঘেরা শহর —
বহুর রই খাঁটি।
হরপ্রসাদ বাংলা ভাষার —
আদি নিদর্শন,
বার করলেন খুঁজে চর্যা —
পদেরই দর্পণ।
ব্রাহ্ম কেশব নৈহাটিরই —
স্মৃতিকথাতে যারা,
ঋষি বঙ্কিম সাহিত্যে ঐ —
স্বর্ণ প্রদীপ ধরা।
নৈহাটিরই শ্যামল মিত্র —
এবং সমরেশ,
গান গেয়ে আর পুঁথি লিখে —
জয় করেছেন দেশ।
নৈহাটিরই সরোজ এবং —
রাঘব আছে গুণী,
আরও কত বড় মাপের —
মানুষ আছেন শুনি।
তাঁদের প্রতি রইল প্রণাম —
ক্ষুদ্র মানবের,
নৈহাটিরই মহামানব —
বিত্ত স্বদেশের।

— x —

চলে গেলেন তোমাদের কল্যাণময় দাদা। কল্যাণময় ঘোষ-এর বাড়ি ছিল নৈহাটিতে। বড় সুন্দর ছড়া লিখতেন তিনি। পেশায় শিক্ষক ছিলেন। স্কুলে কি স্কুলের বাইরে সবার কাছে বড় প্রিয় ছিলেন কল্যাণময়। এ বছরের জানুয়ারির শুরুতে এক দুরারোগ্য অসুখ তাঁকে নিতান্তই অকালে কেড়ে নিয়ে গেল আমাদের কাছ থেকে। জয়ঢাকের জন্য ছ'টি ছড়া এ অবধি লিখেছিলেন কল্যাণময়।

ছড়াগুলো প্রকাশিত হয়েছিলো জয়ঢাকের বিভিন্ন সংখ্যায়।

তাঁর শেষ ছড়াটি ছিল নিজের জন্মের শহর নৈহাটিকে নিয়ে। একটি পত্রিকার দপ্তরে তা পাঠিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু ডাক দপ্তরের গোলমালে সেটি সে পত্রিকার দপ্তরে শেষ অবধি পৌঁছোয় নি। যে পোস্টকার্ডটিতে তিনি শেষ ছড়াটা লিখে পাঠিয়েছিলেন সেটার ছবি এই সঙ্গে ছাপিয়ে দিলাম আমরা। জয়ঢাকের এক বন্ধুর স্মৃতিতে তাঁর লেখা দিয়েই শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায় জয়ঢাক।

পুরাণ কথা

ঋষি মাণ্ডব্য

বহু বছর ধরেই ঋষি মাণ্ডব্য কঠিন তপস্যা করে চলেছিলেন তাঁর আশ্রমের সামনে গাছতলাতে বসে। তখন তিনি জোড়হাত টান টান করে কানের দুপাশ দিয়ে আকাশের দিকে তুলে মৌন তপস্যায় ডুবে থাকতেন।

এই সময়েই এক সন্ধেবেলায় একদল ডাকাত লুঠের মাল সমেত মাণ্ডব্যের আশ্রমের সামনে এসে পড়ে। ডাকাতগুলোকে রক্ষীরা তাড়া করেছিল। ঋষির মৌনীর সুযোগে ডাকাতগুলো আগে লুটের মাল লুকোয় আশ্রমের মধ্যে; তারপর ধরা পড়ার ভয়ে নিজেরাও লুকিয়ে পড়ে আশ্রমেই।

কিছুক্ষণ পরেই রক্ষীরা এসে পৌঁছায় সেখানে। ঋষিকে সামনে পেয়ে প্রথমে তো তারা ঋষির কাছেই জানতে চায় যে কোনো ডাকাতকে তিনি দেখেছেন কিনা। কিন্তু মৌন তপস্যার কারণে ঋষি কোনো জবাবই দিলেন না। রক্ষীরা সন্দেহবশত: আশ্রমটা ঘুরে ফিরে দেখতেই পেয়ে গেল বমাল সমেত ডাকাতগুলোকে। ঋষির মৌনী ডাকাতদের সাহায্য করার ভান মনে করে রক্ষীরা ডাকাতদের সঙ্গে তাঁকেও ধরে নিয়ে গেল রাজার কাছে। সব শুনে রাজা পুরো দলটাকে শূলে গেঁথে মেরে ফেলার হুকুম দিলেন।

ডাকাতদের সঙ্গে শূলে বিঁধেও ঋষি বেঁচে ছিলেন। সেই অবস্থাতেই তিনি তপস্যার জোরে অন্য মুনিদের ডেকে আনলেন তাঁর নিজের কাছে। রাত্রিবেলা অন্ধকারে পাখির বেশে তাঁরা এসে মা ণ্ডব্যকে শূলবিদ্ধ অবস্থায় দেখে খুব কষ্ট পেলেন। তাঁরা বার বার ঋষিকে জিজ্ঞেস করলেন যে কে তাঁকে এই যন্ত্রণা দিয়েছে। মৌন ঋষি নি:শব্দেই জানালেন, ''কাকে দোষ দেব? এ পাপ আমারই''।

এরপর রাজার ন্যায়াধীশ মাণ্ডব্যকে জীবিত দেখে রাজাকে খবর দেন। রাজা এসে ঋষির কাছে ক্ষমা চান; বলেন যে ভালো করে না জেনেই মাণ্ডব্যর মতো তপস্বীকে শূলে চড়াবার জন্য তিনি অনুতপ্ত। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাণ্ডব্যকে শূল থেকে নামিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন রাজা।

কিন্তু শূলের ফলা কিছুতেই ঋষির শরীর থেকে সবটা বার করা গেলো না। অগত্যা রাজা ঋষির শরীরের বাইরে থাকা শূলদণ্ড এবং ফলা কেটে দিলেন পুরোপুরি।

শরীরের ভেতরে শূলের ফলা বয়ে বেড়িয়েই তপস্যায় ত্রিলোক জয় করলেন মাণ্ডব্য। পায়ে হেঁটে তিনি এমনসব জায়গায় পৌঁছলেন কঠিনতম তপস্যা করার জন্য যে সব জায়গায় তাঁর আগে কেউ পৌঁছোয়ই নি। শরীরে শূলের ফলা বয়ে বেড়ালেন না জেনে করে ফেলা অপরাধের পাপে। তাই তাঁর নাম হয়েছিল অনি-মাণ্ডব্য ।

এভাবেই একদিন ধর্মের চূড়ান্ত সত্য জানার পর, তিনি পৌঁছে গেলেন ধর্ম দেবতার দরবারে। দেবতার কাছে জানতে চাইলেন যে কোন পাপে তাঁকে শরীরে শূলের ফলা বওয়ার যন্ত্রণা পেতে হলো। দেবতা জানালেন যে একটা পোকাকে মাণ্ডব্য ঘাসের ধারালো পাতা দিয়ে মেরেছিলেন বলেই তাঁকে শূলের ফলা শরীরে গেঁথে থাকার ব্যথা বইতে হলো। কৌতুহলী মাণ্ডব্য আবারও জানতে চাইলেন যে পোকার সঙ্গে অমানুষিক অন্যায়টা তিনি কবে করেছিলেন? দেবতা জানালেন যে সে নিতান্ত শিশু বয়সের কথা।

মাণ্ডব্য তর্ক জুড়ে দিলেন দেবতার সাথে যে একটা পোকাকে ঘাসের ধারালো পাতা দিয়ে মেরে ফেলাটা সাংঘাতিক কিছু অন্যায় নয়; তার ওপর বারো বছর বয়সের নীচে কোনো অন্যায় করলে চালু কোন শাস্ত্রেই তাকে পাপ বলে ধরার কথা নয়।

নীতি শিক্ষার আগেই না বুঝে করা একটা হত্যার জন্য মাণ্ডব্যকে এইভাবে যে মর্মন্তুদ যন্ত্র ণা দেওয়া হলো তা নিতান্তই দেবতার খামখেয়লিপনা। এরপর ঋষি স্থির করলেন যে বারো নয়, চোদ্দ বছর বয়সের আগে অজান্তে কেউ অপরাধ করলে তাকে পাপ বলে ধরা হবে না। মাণ্ডব্যর লঘু পাপে তাঁকে গুরুদণ্ড দেওয়ার অপরাধে ধর্ম দেবতাকেও সিদ্ধ ঋষি এই অভিশাপ দিলেন যে, তিনি শূদ্রঘরে জন্ম নেবেন অহেতুক লাঞ্ছনা কী তা জানার জন্য। সেই অভিশাপের ফলে ধর্ম দেবতাই শূদ্র মায়ের ঘরে বিদুর হয়ে জন্মেছিলেন মহাভারতের যুগে।

ছবি : মৌসুমী

পুরাতনী

গিলগামেসের গল্প

শ্রী প্রতিভা দেবী, বি এ।

প্রাচীন ব্যাবিলন-সভ্যতা কতদুর উন্নত ছিল, মহাকাব্য গিলগামেস হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গিলগামেস কখন্ রচিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। তবে পণ্ডিতগণের অনুমান এই যে, ইহা খৃ:পূ: ত্রয়োবিংশ শতাব্দী কিংবা আরও প্রাচীনকালে রচিত হইয়া থাকিবে। মোট কথা, এই গ্রন্হখানি প্রায় ৪৫০০ বৎ সরের পুরাতন। সহিত্য, ও গল্প এবং কাহিনীর হিসাবে ইহা অন্যতম প্রাচীন কীর্ত্তি এবং এসিয়ার অতীত সাহিত্য-সমৃদ্ধির সুস্পষ্ট নিদর্শন।

গিলগামেস ছিলেন ইরেক রাজ্যের রাজা। সেখানে ইস্তার দেবীর এক মন্দির ছিল। এই সময় রাজ্যের অবস্হা খুব শোচনীয় হইয়া উঠে। চারিদিকে অত্যাচার ও অবিচার চলিতে থাকে।অ বশেষে নিরুপায় হইয়া সকলে মিলিয়া অরুরু দেবীর নিকট তাহাদের উদ্ধার করিবার জন্য একজন ত্রানকর্ত্তা সৃষ্টি করিবার প্রার্থনা জানায়।বেল, সামাস ও ইস্তার দেবীও তাহাদের সেই প্রার্থনায় যোগ দেন। স্তবস্তুতিতে অরুরু দেবীর দয়া হইল। তিনি মৃত্তিকা দ্বারা এক বীর সৃষ্টি করিয়া দিলেন। তাহার নাম হইল ইয়াবানী । ইয়াবানী আকৃতি ও প্রকৃতিতে অনেকটা হিংস্র বন্যজন্তুর মত। ইরেক রাজ্য হইতে ইয়াবানীর সন্ধানে একজন শিকারীকে পাঠান হইল; সে আসিয়া দেখে, ইয়াবানী একটি ছোট নদীর ধারে কতকগুলি বন্য সাথীর সহিত মিলিয়া জল পান করিতেছে।

শিকারী জানিত, ইয়াবানীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত করিয়া অসম্ভব। তাই সে বৃথা চেষ্টা না করিয়া একটি পরমাসুন্দরী মেয়েকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিল। সেই মেয়েটি ইয়াবানীকে ভুলাইয়া গিলগামেসের রাজ্য ইরেক দেশে লইয়া আসিল।ইয়াবানী গিলগামেসের বীরত্বের কথা শুনিয়া ইয়াবানীর তাঁহার শক্তি পরীক্ষার ইচ্ছা হয় এবং তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করে, কিন্তু সূর্য্যের দেবতা সামাস তাঁহাকে নিবৃত্ত করেন। পরে তাঁহারা দুইজনে অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া উঠেন ও দুইজনে মিলিয়া ইলামোর রাজা শাম্বাকে যুদ্ধে পরাস্ত করে ও নিহত করেন। এইরূপে ইরেকের প্রধান শত্রু বিনষ্ট হইল।

ইহার পরে গিলগামেস ও ইয়াবানীর কিছুদিন বেশ আনন্দে কাটে। কিন্তু এই সময় এক ভারী বিপদের ছায়াপাত হইল। গিলগামেস দেখিতে অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। রাজাচিত বসন-ভূষণে তাহাকে আরও সুন্দর দেখাইত। ইস্তার দেবী তাঁহাকে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া বলিলেন, গিলগামেস! তুমি আমাকে বিবাহ কর। পৃথিবীতে মানুষ যে সুখ কামনা করিয়া থাকে তাহার সমস্তই আমি তোমাকে দিব।

গিলগামেস ইস্তার দেবীর পূর্ব্বের প্রিয়পাত্রদের শোচনীয় দুর্দ্দশার কথা জানিতেন। তাই তিনি বিনীত ভাবে দেবীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহাতে ইস্তার দেবী ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন। কী, মানুষ হইয়া এত বড় আস্পর্দ্ধা। তিনি তাঁহার পিতা আনুকে ইরেক-রাজকে মারিবার জন্য একটি ভীষণাকৃতি ষাঁড় তৈয়ারী করিয়া দিতে বলিলেন। আনু ভাবিয়া দেখিলেন, গিলগামেস এমন কিছু গুরুতর অপরাধ করেন নাই, কিন্তু তবুও স্নেহশীল পিতা কন্যাকে সুখী করিবার জন্য এক ভয়ঙ্কর বৃষাসুর সৃষ্টি করিয়া দিলেন।

গিলগামেস শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার রাজ্য বিনাশ করিবার জন্য ইস্তারদেবী এক ভীষণদর্শন ষাঁড় পাঠাইয়াছেন। তখন ইয়াবানী ও গিলগামেস দুইজনে মিলিয়া সেই ষাঁড়কে ম ারিবার জন্য যাত্রা করিলেন এবং অল্পকাল পরেই উহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। বৃষাসুরকে মারিয়া ফেলাতে ইস্তার দেবীর রাগ আরও বাড়িয়া গেল। তিনি ইয়াবানীকে অভিশাপ দিলেন এবং তাহার ফলে সে অল্পকাল মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

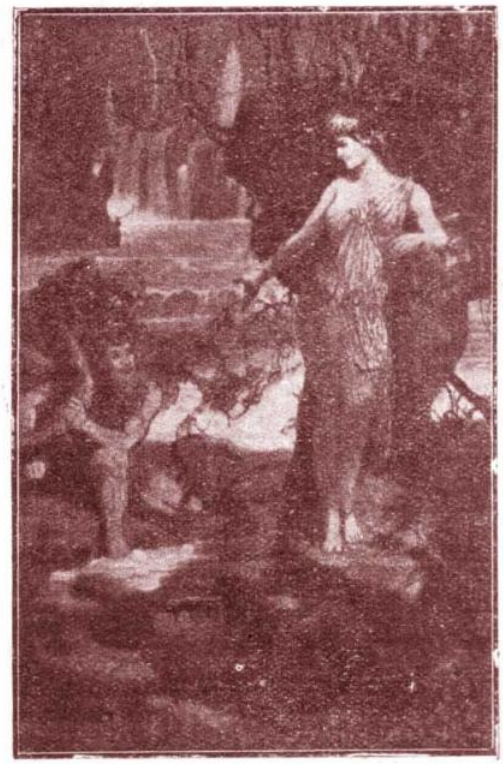

একদিন রাত্রিতে গিলগামেস স্বপ্নে ইস্তার দেবীকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার ক্রুদ্ধ ভীষণ মুখের দিকে গিলগামেস সভয়ে তাকাইলেন ইস্তার বলিলেন, আমার বৃষকে মারিয়া ভাবিওনা যে আমার ক্রোধ এড়াইয়াছ। আমি তোমাকে অন্য উপায়ে জব্দ করিব। তোমার যে রূপের এত গর্ব্ব, জাগিয়া দেখিবে তাহার কিছুই নাই। তুমি দেখিতে এত কুৎসিত হইবে যে, সবাই তোমাকে ঘৃণা করিবে। এই বলিয়া ইস্তার দেবী অন্তর্হিত হইলেন।

ঘুম ভাঙ্গিয়া গিলগামেস দেখেন, তিনি সত্য সত্যই দেখিতে অত্যন্ত কদাকার হইয়াছেন। কোথায় বা তাঁহার সেই সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ ঋজুদেহ, কোথায় বা তাঁহার সেই সুগৌর বর্ণ ও সুশ্রী মুখশ্রী।

ক্ষোভে দু:খে গিলগামেস নির্জন বনে চলিয়া গেলেন। কি করিয়া তিনি আবার পূর্ব্বের স্বাস্থ্যসৌন্দর্য্য ফিরিয়া পাইবেন, তাহাই আকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতে চলিতে তিনি অবশেষে 'মাসি' বা সূর্য্যাস্ত পাহাড়ে যাইবার অন্ধকার পথের সন্মুখে উপস্থিত হইলেন। সে-পথের মুখে দুইজন ভীষণ প্রহরী-তাহাদের মুখ বিছার মত, শরীর ম ানুষের মত। তাহাদিগকে দেখিয়া গিলগামেস ত ভয়ে অজ্ঞান হইবার জোগাড়। বিছামানুষেরা কিন্তু তাঁহাকে কিছুই বলিলেন না। বরং করুণ সমবেদনাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহাদের দৃষ্টিতে ভরসা পাইয়া তিনি তাহাদিগকে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ পিরনাপিসটিম-এর নিকট যাই বার পথ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিছামানুষ বলিল, 'প্রথমে তোমাকে এই ঘোর অন্ধকার 'মাসি' পর্ব্বত পার হইতে হইবে। অন্ধকার পর্বত পার হইতে পারিলে সমুদ্রের তীরে এক সুন্দর বন দেখিতে পাইবে। সেই বন পার হইয়া সমুদ্রের রাণী সবিতুকে স্তব-স্তুতিতে সন্তুষ্ট করিও, তিনিই তোমাকে পথ বলিয়া দিবেন।' কৃতজ্ঞচিত্তে সেখান হইতে বিদায় লইয়া গিলগামেস পাহাড়ে চড়িলেন।প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা সেই অন্ধকারে পথ খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিলেন কিন্তু সেই ভীষণ অন্ধকারে কিছুই দেখা যাইতেছিল না। এই সময় সৌভাগ্যক্রমে একটি আলোক-রেখা দেখিতে পাইলেন। সেই আলোক-রেখা ধরিয়া চলিতে চলিতে তিনি পাহাড় পার হইয়া গেলেন এবং সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাইলেন।

তিনি সেখানে একটুও বিলম্ব না করিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন এবং করজোড়ে সমুদ্রের রাণী সবিতু দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন।

সবিতু এই কাতর প্রার্থনায় বিচলিত হইয়া বলিলেন, গিলগামেস! সাধু সমাস ব্যতীত অন্য কোন মানুষ এপর্য্যন্ত সমুদ্রপার হয় নাই। এক সমাসের মাঝি আরাড্রা তোমাকে পার করিতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে কালো পোষাক পরা একটি মাঝি একটি ছোট্ট নৌকায় চড়িয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সবিতু দেবীকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া গিলগামেস নৌকায় চড়িলেন। প্রায় ৪০দিন দুইজনে নৌকা বহিয়া চলিলেন। অবশেষে তাঁহারা মরুসাগর পার হইয়া শান্তিদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। সেই দ্বীপে গিলগামেসের পূর্ব্বপুরুষ পিরনাপিসটিম ও তাঁহার পত্নী তাঁহাকে অত্যন্ত আদর করিয়া কহিলেন, ''এস বৎস! বহু কষ্ট ভোগ করিয়াছ! এইবার শান্তিদ্বীপে তুমি তোমার শ্রমের পুরষ্কার পাইবে।''

গিলগামেস বলিলেন বলিলেন, ''পিতা!আপনার আশ্বাসবাণী শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। এখন কি করিয়া আমি আমার পূর্ব্বের স্বাস্থ্য-সবল সুন্দর দেহ ফিরিয়া পাইব, তাহাই বলিয়া দিন।''

গিলগামেসের পূর্ব্বপুরুষ কহিলেন, ''পুত্র! ব্যস্ত হইওনা। এখন আহার করিয়া নিদ্রা যাও। দেবতার কৃপায় তুমি পূর্ব্বের রূপ-স্বাস্থ্য সমস্তই ফিরিয়া পাইবে।'' এই বলিয়া তিনি তাহাকে মন্ত্র পুত খাদ্য খাইতে দিলেন। সেই আহারের পরে গিলগামেস ছয়দিন ছয়রাত অনবরত ঘুমাইলেন।ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখেন, তাঁহার দেহে মত্তহস্তীর বল ফিরিয়া আসিয়াছে। মনের আনন্দে তিনি সৌন্দর্য্যের ঝরণায় নামিয়া স্নান করিলেন। জল হইতে উঠিয়া দেখেন, তিনি সেই পূর্ব্বের সুপুরুষ গিলগামেসই আছেন। অতন্ত্য কৃতজ্ঞ চিত্তে গিলগামেস তাঁহার পূর্ব্বপুরুষকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইয়া এবং তাঁহার নিকট হইতে অজস্র আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ইরেক রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন।

বহু দিন পরে গিলগামেস ফিরিয়া আসায় প্রজারা খুব খুশী হইল। ইস্তার দেবীর ক্রোধ শান্তির জন্য গিলগামেস তাঁহার বহু পূজা-অর্চ্চনা করিলেন। অবশেষে দেবীর রাগ দূর হইল। মানুষ হইয়া দেবতার সম্মান লাভ করিয়া গিলগামেস বহুবৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শিশু ভারতী। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত।বানান অপরিবর্তিত।

স্মরণীয় যাঁরা

এ বছরের পয়লা জানুয়ারি , ৯২ বছর বয়সে চলে গেলেন বাঘমানুষ বিলি। এই সংখ্যায় তাঁর গল্প বলি এসো।

১৯১৭ সালের ১৫ আগস্ট গোরখপুরে জন্ম। পুরো নাম কুমার (বিলি) আর্জান সিং। কাপুরথালার আলুওয়ালিয়া রাজপরিবারের ছেলে বিলির বাবা ছিলেন কুমার যশবীর সিং ও ঠাকুরদা ছিলেন রাজা হরনাম সিং। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়ে ইরাকে যুদ্ধে গেলেন বিলি। ফিরে এসে সুদূর লখিমপুর খেরি-তে কিছু জমিজিরেত কিনে চাষবাসে মন দিলেন রাজকুমার। বাবার স্মৃতিতে জমিদারির নাম রাখলেন যশবীর নগর।

শিকারে প্রবল আগ্রহ ছিল রাজকুমারের। ১২ বছর বয়সে প্রথম লেপার্ড শিকার করেছিলেন। চোদ্দো বছর বয়সে মারেন প্রথম বাঘ। তারপর বাঘ সহ অন্যান্য পশুপাখি কত যে তাঁর বন্দুকের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে কে জানে! চাষবাস আর শিকার, এই দুই নিয়ে দিব্যি জীবন কেটে যাচ্ছিল মধ্যবিত্ত এই জমিদারের, আর দশটা ভারতীয় জমিদারের মতই। কিন্তু বাদ সাধল এক তরুণ লেপার্ড। রাতের অন্ধকারে শিকার করতে বেরিয়ে গাড়ির হেডলাইটের আলোয় ধরা পড়েছিল সে। গুলি ছুঁড়লেন বিলি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল না তরুণ সেই প্রাণীটি। দীর্ঘক্ষণ ধরে অত্যন্ত যন্ত্রণা পেয়ে তিল তিল করে মারা গেল সে। গোটা ব্যাপারটা সামনে থেকে দেখে কী যে হয়ে গেল তাঁর মনের মধ্যে কে জানে! কিন্তু সেদিন শিকার খেলা থেকে ফিরে বিলি একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। আর রক্তপাত নয়।

এরপর লখিমপুর খেরির নিবিড় জঙ্গলের সান্নিধ্যে চাষবাস নিয়ে দিব্যি ছিলেন প্রথমে। জায়গাটায় বারশিঙা হরিণ ছিল অনেক। দিনে রাতে যখন তখন শোনা যেত তাদের ছুটন্ত ক্ষুরের দড়বড় শব্দ। ফসল চুরি করতে ওস্তাদ ছিল বারশিঙার দল। কিন্তু তাতে বিলি কিছু মনে করতেন না। হাজার হোক, প্রতিবেশী তো!

কিন্তু তারপরে স্বাধীনতার পর যখন পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুর ঢল নামল সেই এলাকায়, তখন গভীর জঙ্গল কমে আসতে শুরু করল। এক সময় তাঁর চাষজমির পাশ দিয়ে বারশিঙা হরিণের পালের উদ্দাম দৌড়ের যে শব্দ উঠত তা-ও থেমে আসছে এবারে। বনভূমির সংকোচনে এবং চোরাশিকারীদের হাতে শেষ হয়ে আসছে তাদের অস্তিত্ব। বিলি প্রমাদ গুনলেন।

এই সময়ে, ১৯৫৯ সালের এক গ্রীষ্মের দুপুরে বিলি জঙ্গলে ঘুরছিলেন তাঁর প্রিয় হাতি বন্ধু ভগবান পিয়ারীর পিঠে চেপে। ঘুরতে ঘুরতে, দুধওয়ার অরণ্যভূমির মধ্যে নেওরা আর সোহেলি নদীর সঙ্গমে একটা বিরাট অরণ্যময় জমিতে গিয়ে পৌঁছোলেন তিনি। দেখামাত্র পছন্দ হয়ে গেল তাঁর। বিরাট সেই জমিটিকে কিনে নিয়ে সেইখানে প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর প্রাণীসংরক্ষণ কেন্দ্র টাইগার হ্যাভেন বা ব্যাঘ্র আশ্রম। এরই ভেতরে একটা ছোট কৃষিফার্ম তৈরি করে নিয়ে উঠে এলেন তিনি। এর পর থেকে বাকি জীবনের অধিকাংশ সময়টাই এই আশ্রমে কাটিয়ে গিয়েছেন বাঘমানুষ বিলি।

বিয়ে করেন নি। সংসার বলতে তাঁর সঙ্গে থাকত চতুষ্পদ আর ডানাওয়ালা সব পুষ্যি। থাকত হাতি বন্ধু ভগবান পিয়ারী, তিন লেপার্ড-প্রিন্স,হ্যারিয়েট আর জুলিয়েট, সাইবেরিয়ান বাঘিনী তারা, কুকুর এলি, বাঁদর এলিজাবেথ টেলর ও সিস্টার গুপতারা, টম ডুলি নামে এক ময়ূর আর মেছো বেড়াল টিফানি।

টাইগার হ্যাভেনে প্রথমে তিনি তৈরি করলেন বিস্তীর্ণ ঘাসজমি, নুনিয়া বা সল্ট লিক এবং প্রাণীদের জল খাবার জন্য বেশ কিছু ওয়াটারিং হোল বা জলাশয়। তারপর ঘোলা এলাকা থেকে ভগবান পিয়ারী আর তার সঙ্গে লোকজনের দল মিলে বারশিঙার একটা দলকে তাড়িয়ে নিয়ে এল সেই নিরাপদ আশ্রয়ে। বেঁচে গেল বারশিঙার দল। মানুষের ওপর যেমন ভগবান থাকেন তেমনি বারশিঙাদের ওপর নিরাপত্তার ছাতা ধরে দাঁড়ালেন রাজপুত্র আর্জান সিং।

তবু সেই হ্যাভেনের বাইরে বারশিঙা হরিণদের বিপদ কাটল না। ১৯৬৪ সালের কথা। টাইগার হ্যাভেনে রাজকুমারের সঙ্গে দেখা করতে এলেন জর্জ স্ক্যালার। দুজন মিলে ঘোলা-র অরণ্যে সমীক্ষা করে দেখা গেল বারশিঙার সংখ্যা সেখানে কমতে কমতে ছ'শোয় এসে দাঁড়িয়েছে। সে বছরই উত্তর প্রদেশ রাজ্য বন্যপ্রাণী বোর্ড তৈরি হয়েছে। এইবারে আর্জান তার দ্বারস্থ হলেন বারশিঙাদের প্রাণভিক্ষা চেয়ে। প্রার্থনা জানালেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছেও। চেষ্টার ফল ফলল অবশেষে। ২০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ছড়ানো দুধওয়াকে অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হল। বেঁচে গেল বারশিঙারা। টাইগার হ্যাভেন ছিল এই দুধওয়ার একেবারে কেন্দ্রিয় অংশে।

চোরাই শিকারীদের ওপর একেবারে খড়্গহস্ত ছিলেন রাজকুমার আর্জান। একবার তো টাইগার হ্যাভেনে ঢোকা এক চোরাশিকারীকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখলেন একটা শস্যগোলায়। আটক হয়ে মাথার ওপর ছাদের দিকে তাকিয়ে সে দেখে, কড়িকাঠ পেঁচিয়ে ঘোরঘুরি করে তার দিকে নজর দিচ্ছে পেল্লায় এক অজগর সাপ। বেজায় ভয় পেয়ে গিয়েছিল বেচারা। সে আর কেমন করে জানবে ও হল গিয়ে রাজকুমারের প্রিয় বন্ধু মন্টি!

প্রিন্স নামে যে লেপার্ডটিকে পুষেছিলেন তিনি তাকে একসময় জঙ্গলে ছেড়েদিলেন স্বাধীনভাবে বাঁচবার জন্য। সঙ্গে হ্যারিয়েট আর জুলিয়েটকেও ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুষ্টু ম ানুষেরা বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে দুটো মেয়ে চিতাকেই। বেঁচে যায় শুধু প্রিন্স।

ইংল্যান্ডের এক চিড়িয়াখানা থেকে একটা ছোট্ট সাইবেরিয়ান বাঘিনীছানাকে দত্তক নিয়ে টাইগার হ্যাভেনে নিয়ে এসেছিলেন আর্জান। তার নাম রেখেছিলেন তারা। মা বাঘ যেমন যত্ন করে তার ছানাকে খাওয়ায় , শিকার শেখায় তেমনিভাবে তারাকে যত্ন করে দু বছরেরটি করে তাকে দুধওয়ার জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি। আমাদের দেশে জাতিভেদ প্রথা কী ভয়ংকর তা তো জানো। বাঘিনী তারা-ও তার অভিশাপের হাত থেকে ছাড় পায়নি। দেশীয় রয়্যাল বেঙ্গল

টাইগারের সঙ্গে তারার সাইবেরীয় পিতৃপরিচয় মিশুক সেটা একেবারেই চায়নি ভারতীয় বনকর্মীরা। তারা তাই করল কি , একবার সুযোগ পেয়ে ঘোষণা করে দিল তারা নরখাদক হয়ে গিয়েছে। অতএব আনো বন্দুক। মেরে ফেলো তারাকে। তাহলেই সব সমস্যা শেষ। একদিন একটা বাঘিনীকে গুলি করে মেরে ফেলা হল তারা ভেবে। হাঁফ ছাড়ল বনকর্মীরা। এ দেশের বাঘেদের বিশুদ্ধতা রক্ষা পেয়েছে। ভিনদেশী বাঘিনী শেষ।

ভাগ্য কিন্তু আর্জানের পক্ষে ছিল। পরে দেখা গেল যে বাঘিনীটাকে মারা হয়েছে সে তারা নয়। অনেক বছর বেঁচে ছিল তারা এর পর। তারার বংশধরেরা সম্ভবত দুধওয়ার জঙ্গলে এখনো আছে। মিশে গেছে তারা স্থানীয় বাঘেদের সাথে। সেই বাচ্চাদেরও পরে মেরে ফেলার চেষ্টা হয়। কিন্তু তা সফল হয়নি।

এমনিভাবেই কেটে গেল এটা শতাব্দি। সরকারী নীতির বিরুদ্ধে, চোরাশিকারীদের বিরুদ্ধে আমৃত্যু নিরলস লড়াই চালিয়ে গেলেন এই মানুষটি। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এ কাজে তিনি সমর্পিত ছিলেন পুরোপুরি। সারাজীবনে তাঁর কাজের জন্য পুরষ্কার পেয়েছেন অনেক। ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী উপাধিতেও ভূষিত করেছে। কিন্তু আসল পুরষ্কার তাঁর ছিল অরণ্যের পশুদের সান্নিধ্য আর ভালোবাসা। সেই পুরষ্কারটির লোভে মৃত্যুর আগে অবধি অরণ্যভূমি ছেড়ে কোথাও যান নি তিনি। শেষ নি:শ্বাসও ফেলেছেন লখিমপুর খেরি-র সেই প্রথম অরণ্যনিবাসে।

দুধওয়ার মুকুটহীন রাজা, বাঘমানুষ বিলি আর্জান সিংকে জয়ঢাক তার সমস্ত পাঠপাঠিকার তরফে সেলাম জানায়। আমাদের দেশের মূক বন্যপ্রাণীদের জন্য এমন মানুষের আজ বড় বেশি করে প্রয়োজন।

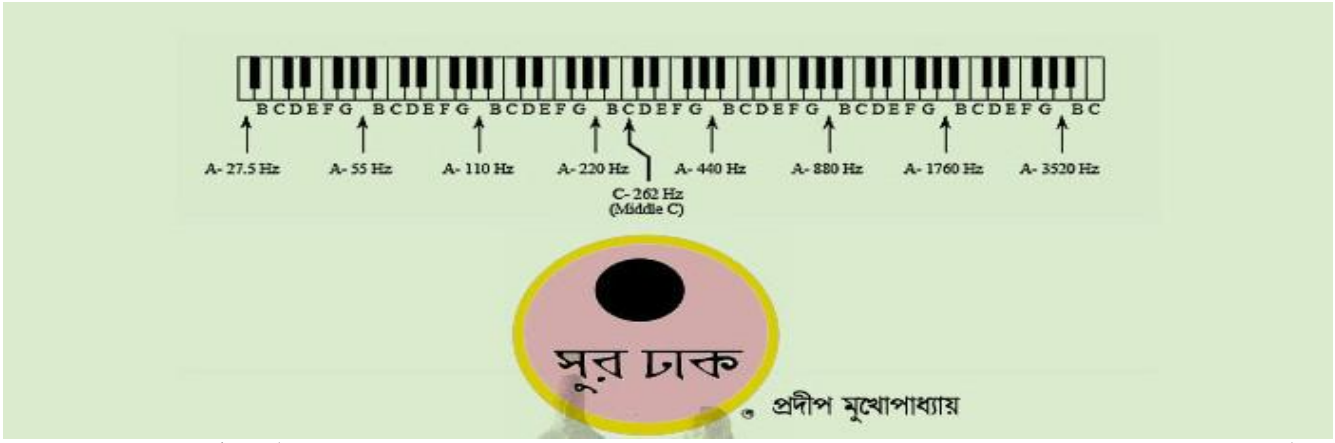

যারা অন্তর্জাল (ইন্টারনেট) সংখ্যা পড়তে পারছ তারা এটা পড়া শুরু করার আগে একটা দারুণ মজার সাইটে নিজেদের পরীক্ষা করে নিতে পারো। খুব সহজ পরীক্ষা - সাইটটা খুললে একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপনের ভিডিও ক্লিপের পরই এইরকম দেখতে একটা মূর্তি ঘুরছে দেখা যাবে - মূর্তিটা তোমার ক্লকওয়াইজ (ঘড়ির কাঁটা যেমন করে ঘোরে) ঘুরছে মনে হচ্ছে নাকি অ্যান্টি-ক্লকওয়াইজ ঘুরছে বলে মনে হচ্ছে এটুকুই পরীক্ষা... ব্যাস।
http://www.perthnow.com.au/fun-games/left-brain-vs-right-brain/story-e6frg46u-1111114517613

এটুকুতেই জেনে গেলে তো তুমি বাঁ-মস্তিষ্ক না ডান-মস্তিষ্ক প্রবণ!

ভাবছো এতে কি এল গেল?

তাহলে শোনো -

খন্ড-মস্তিষ্ক(স্প্লিট ব্রেন) গবেষণার জন্য যিনি ১৯৮১ সালে নোবেল পুরষ্কার পান সেই আর.ডব্লু. স্পেরির কাজের আগে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল কর্পাস কলোসম মানে, যে স্নায়ুতন্তুগুচ্ছ দিয়ে মস্তিষ্কের ডান দিক দিক সংযুক্ত, সেটা সরিয়ে দিয়ে মস্তিষ্কের দুটো অংশ আলাদা করে ফেললে মানুষের ব্যবহারে কোন বিশেষ চোখে পড়ার মত তফাৎ দেখা যায় না। কিন্তু নোবেলজয়ী স্পেরিই প্রথম দেখালেন যে কর্পাস কলোসম সরিয়ে ফেললে মস্তিষ্কের দুটো অংশের ভেতর তথ্য আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে যায়। ভাবছ তাতেই বা কী এমন এল গেল?

তাহলে দেখ - মস্তিষ্কের এই দুটো অংশের কাজের মূল তফাৎগুলো -

বাঁ দিক	ডান দিক
যুক্তি-তর্ক	অনুভব
খুঁটিনাটি	বড় ছবিটা (বিশ্ব-ভুবন)
বাস্তবতা-নির্ভর	কল্পনাপ্রবণ
শব্দ ও ভাষা	চিহ্ন ও ছবি
বর্তমান ও অতীত	বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
অঙ্ক-বিজ্ঞান	দর্শন-ধর্ম
বুঝতে পারা	ধরতে পারা
জানা	বিশ্বাস
কর্ম-পন্থা	সম্ভাবনা
ক্রিয়াশীল	আবেগপ্রবণ
নিরাপত্তা	ঝুঁকি

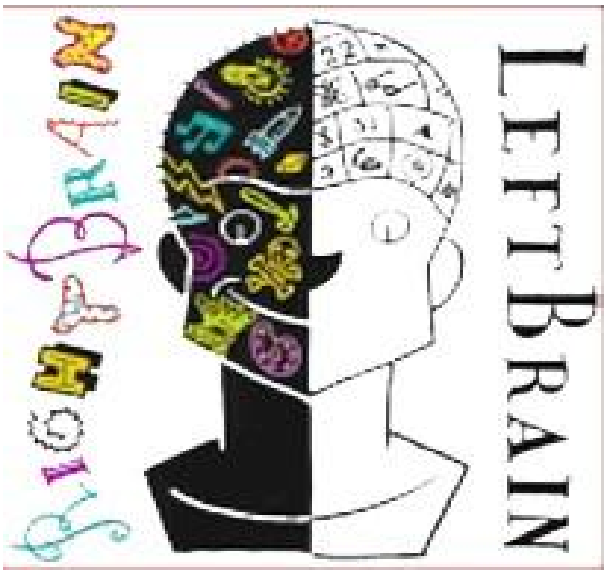

তাহলে দেখা যাচ্ছে মস্তিষ্কের বাঁ আর ডান দিকের ব্যাপার-স্যাপার দু'রকম। বাঁ দিকটা বেশ কেজো (মানে দুয়ে দুয়ে সব সময়ই চার - দুধ কখনই নয়) - আর ডান দিকটা সৃষ্টিশীল। গবেষণায় জানা গেছে স্কুলে যাবার আগে অবধি ছোটরা বেশিরভাগই বেশ সৃষ্টিশীল থাকে। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্হায় আঁকা বা অন্যান্য কল্পনা-নির্ভর শিক্ষার চেয়ে অঙ্ক, যুক্তি আর ভাষার দক্ষতার দিকে অর্থাৎ বাঁ-মস্তিষ্কের কাজের ওপর বেশি জোর দেবার ফলে শিশুদের প্রায় নব্বই ভাগই সৃষ্টির আনন্দ হারিয়ে ফেলে বছর সাতেক বয়স হতে না হতেই। তারপর কমতে কমতে বড়দের মধ্যে শতকরা দু-জনের ভেতরই মাত্র থেকে যায় সৃষ্টিশীলতা। এই অদ্ভুত ব্যবস্হার ফলে আমাদের বেশিরভাগের চেতনার জগৎ শাসন করে বাঁ মস্তিষ্ক ,আর সেই কারণেই বিভিন্ন সৃষ্টিশীল শিল্পের ভেতরেও কল্পনার সৌন্দর্যের জায়গা নিয়ে নিচ্ছে যুক্তি-তক্কো, হিসেব -নিকেশ।

আমাদের চেতন মন একবারে শুধু এক ধরণেরই তথ্য নিয়ে কাজ করতে পারে। কর্পাস কলোসম দিয়ে যদিও খুবই দ্রুত দুই মস্তিষ্কের ভেতর তথ্যের আদান প্রদান হতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে তা সব সময় খুব কার্যকরী হয় না। শেষ অব্দি দুটোর যে কোন একটা মস্তিষ্ককেই সঁপে দিতে হয় দায়িত্ব। দুই মস্তিষ্কের এই যুদ্ধে আধুনিক মানুষ বেশিরভাগ সময় কেজো মস্তিষ্কের কাছেই চেতনা সমর্পন করে। পৃথিবীটা তাই আর স্বপ্নের দেশ হয় না।

ধ্যান, যোগ, সঙ্গীত বা অন্য কোন শিল্পের সাহায্যে মানুষ বাঁ মস্তিষ্ককে কিছুক্ষণের জন্য অকেজো করে দিতে পারে। যেমন বার বার কোন মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকলে বিষয়-বৈচিত্রের অভাবে মস্তিষ্কের বাঁ দিকটা একটু ঝিমিয়ে পড়লেই ডান মস্তিষ্ক চুপিসাড়ে ঢুকে পড়ে আসরে। চেতনার দখল নিয়ে আমাদের নিয়ে যায় আবেগপূর্ণ বর্ণোচ্ছল অনুভুতির জগতে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই যুক্তিনির্ভর বাঁ মস্তিষ্ক আমাদের টেনে বের করে নিয়ে আসে কঠিন বাস্তবের মাটিতে, আর ডান মস্তিষ্ক শুধু ঘুমের সময় স্বপ্নের জগতে নিয়ে যাবার অপেক্ষাটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে।

রজার ওয়ালকট স্পেরি (১৯১৩-১৯৯৪) বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রমান করেছেন যে শিশুদের বেড়ে ওঠার সময়টাতেই মস্তিষ্কের কোষগুলোর ওয়্যারিং মোটের ওপর স্হায়ীভাবে হয়ে যায়।

চিত্রস্বত্ব - ক্যালিফোর্ণিয়া ইন্সটিট্যুট অফ্ টেক্নোলজি

সেই আয়না

জয়ঢাক-পড়ুয়াদের জন্য এবারে কলম ধরলেন শিল্পী সুজয় রায়, তুলির সাথে কলমেও শব্দছবি আঁকায় যাঁর জুড়ি মেলা ভার। তিনি নিয়ে এসেছেন এক আশ্চর্য জাদু আয়না, যার বুকে ধরা পড়েছে পুরোনদিনের সব ছবি, বিহারের গ্রামদেশে কাটিয়ে আসা এক সুন্দর ছোটবেলার গল্পকথা। এসো, আমরা সবাই মিলে দেখতে বসি–

জীবনের সিঁড়ি বেয়ে অবতরণ। সেই আয়নার সামনে দাঁড়ালে কানে বাজে সময়ের ভোঁ দৌড়। আয়নার ছায়াকে কলমের মসী দিয়ে দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি গড়ি।

কলমের কোলাহল থেমে গেলে বাড়িটা আজকাল একলা খাঁ খাঁ করে। দ্বিতল বাড়ির সবক'টা ঘর খালি। নিস্তব্ধতা থই থই করে। যে ঘরে বাল্যজীবনটা বিছানায় কুন্ডলী পাকিয়ে ভোরের আশায় এক চিলতে আলোর প্রতীক্ষা করত, সেখানে আলসে দিনগুলি অনবসরের উজান ঠেলে আর ফিরে আসে না। ঠাকুর ঘরটা অলীক অন্ধকার ঠেকে, যেখানে একসময় সংসারটা কতই না মাথা ঠুকেছে। ফসলের গোলা শূন্য। মানুষেরা নেই। তবুও কলমের হাওয়ায় ফানুস ওড়াচ্ছি শূন্য বন্ধ্যা অতীতে। মানুষের পথিক ইতিহাস। কলমের ছুটি নেই। লিখি কেন? নিজেকে ভোলাবার জন্য। কলম স্তব্ধ হলে অতীতের বুকফাটা হাহাকার কানে আসবে, ''নেই, নেই, নেই!'' ণত্ব ষত্ব ভুলে কেঁদে উঠবে, ''বাবা''!

যতদিন লেখা দিয়ে অক্ষরের কালো শরীরে জীবনের ভাস্কর্য খোদাই করে চলা যায়, ততদিন আরব্য রজনীর পিদিম হেমবাবুর দ্বিতল বাড়িতে বহু কক্ষে ঝলমল করবে। পালে হাওয়া নেই, তবুও অতি কষ্টে কলমের বৈঠা বেয়ে চলা।

বাড়িতে বিয়ে লাগলে গ্রাম উজাড় করে খাওয়ার পাত পড়ত। ভিয়েন বসত বাড়ির বাগানের গায়ে। বাড়ির ভেতরেও উৎ সবের জন্য ছিল তিনটে আলাদা রান্নাঘর। ধানের ক্ষেতের লালচে রঙের মোটা চাল মোটা বসনের মতো আমজনতাকে মুষ্টিখোলা আনন্দ দিত। গ্রামের প্রজারা, চাষীরা বসেছে সারি সারি। কয়েক মাস আগে থেকেই খাওয়ার গন্ধ গ্রামের আকাশে। বাতাসে নাক পাতছিল সবাই, গ্রামে একটা বিয়ে লাগতে যাচ্ছে।

''পরাণের ভেতরটা হাঁচোর পাঁচোর করত্যাছিল কর্তা'', এক মুসলমান প্রজা শুনিয়ে দিল। সোনা মুগের দাল, ভাজা, রুই, কাতলা, খাট্টা খোট্টাই দই, মুড়কি। মিষ্টির নাম খাজা, যেটা পাতে দিলেই পিঁপড়েরা হত্যা দেয়! ছোট পিসেমশায় বাঘের মতো ভাঁড়ার আগলে বসে আছেন। রোজ

সকালে চব্বিশটা ডিমসেদ্ধ খেয়ে প্রথম কথা বলেন, ''জীবনটা গোল্লায় গেল''। আমরা পঙ্গপাল ভাইয়েরা পরিবেশন করছি। পিসেমশায় কোড ল্যাঙ্গোয়েজ-এ নির্দেশ দিচ্ছেন, ''টিপে টিপে দাও,'' অর্থাৎ ভাঁড়ারে উদ্বৃত্ত আছে, নির্ভয়ে এগিয়ে যাও। সকলে আবেদন করছে, হাতা, খুন্তি ফেলে দিন, খাবারের হাঁড়ি, কলসি, ঝুড়ি যা আছে পাশে রেখে যান, কষ্ট দেব না বাবুদের। পিসেমশাইয়ের হুকুম শোনা গেল, ''খাবার রিপিট করো, ডিফিট হয়ো না,'' অর্থাৎ কিনা সমঝে চলো, একটু সযত্নে হাতটান করো। শেষবারে তারস্বরে চিৎ কার করে উঠলেন, ''ওরে তোরা ঢেলে ঢেলে দে!'' অর্থাৎ কিনা ভাঁড়ার শূন্য। অতিথিরা ততক্ষণে গলাভর্তি খেয়ে বিশাল জালার মতো গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে। এক খাওয়াতেই বাজিমাত।

সেই আয়নার গায়ে ট্রেনের ধোঁয়া ভেসে উঠল কেন? ও হরি, বরযাত্রী আসছে কলকাতা থেকে। আশায় মালা জপ করতে করতে। জ্যাঠতুতো বোনের বিয়ে। ঠাকুর্দা চিঠির পাতায় হিসেবি বুদ্ধি মিশিয়ে বংশানুক্রমিক বাঁশবনের রাজত্বটাকে মুখরোচক করে তুলে দিয়েছেন বকুলবাগানে বোনের ভাবী শ্বশুরকুলের হাতে। সেখানে তারা
ভাবছে, ''আহা, কি কুলমর্যাদা! কখনো চাকরি করে গতর নষ্ট করে না। বাড়ির খায়, দিন দুপুরে তোফা নিদ্রা যায়। সখের প্রাণ গড়ের মাঠ।'' আশা ভরা একটা লম্বা দম বুকে টেনে বরযাত্রীর দল শেয়ালদা স্টেশনে ট্রেনে চেপে রওনা দিল। রাত ভোর হলে ট্রেন এসে পড়বে ''তিন পাহাড়ের''
মাথার ছায়ায়। আরো একটু এগিয়ে গিয়ে সাহেবগঞ্জ জংশন। সেখান থেকে বালিতে পা ডুবিয়ে যাওয়া গঙ্গা স্টিমার ঘাটে। আগের দিন আকাশ ফুঁড়ে পানি এল, তাই বালিতে কাদাতে পায়ের তলায় তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। হাত দিয়ে পা টেনে তুলে নিয়ে কাদার কাছ থেকে দখলদারি নিতে হচ্ছে। কুলি মালের বহর দশভূজা হয়ে তুলে নিয়ে বোঝাই বজরার মতো কাদার বাঁধন ছিন্ন করে ছুটে চলেছে স্টিমারে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য। স্টিমারে জায়গার সংকুলান বড় কম। ভোর সকালে এমন কর্মব্যাস্ততার জন্য মনটা প্রস্তুত নয়। এদিকে কাদার সঙ্গে নিজের লড়াই, ওদিকে কুলিসর্দার যাত্রীর জনতাকে ছেড়ে দলছুট হয়ে হারিয়ে গেল। জান রাখি, না মাল রাখি? ওদিকে মান সম্মান জলাঞ্জলি। কার গৃহিণী কার কর্তার কাছার খুঁট ধরে ''ওগো শুনছো, ওগো শুনছো'' ডাকে অরণ্যে রোদন করছে তার হিসেব করার সময় কোথায়? কর্তা বিহারী কুলির টিকি লক্ষ্য করে একই জায়গায় কাদায় দাঁড়িয়ে ছোটাছুটির মোটামুটি স্লো মোশান নাটক করে চলেছেন। পার্কস্ট্রিট মার্কা এক সুবেশা মহিলা চলেছেন দার্জিলিঙে। কিন্তু কাদার পায়েসে মাছির মতো লটকে আছেন। এত ক্লেশ কেন? কারণ এপারে বাংলা, ওপারে বিহার, মধ্যিখানে গঙ্গা। এপারে যেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কর্মব্যাস্ততা চলেছে।

আমাদের বরযাত্রীরা উথালি পাথালি করে স্টিমারে এসে স্বস্তির নি:শ্বাস ছাড়ল। স্টিমারের সারেং খবর পেল এরা হেমবাবুর বড়ছেলের মেহমান। গলায় গামছা বেঁধে ছিটকে ছুটে এল, ''কর্তা, কর্তা, কী চাই বলো, কী তব বার্তা? জামাই বাবাজি বিয়ে করতে চলেছে? আমারও নিমন্ত্রণ আছে সেথায়। ওপরের ডেকে তোমাদের জন্য গার্ডেন চেয়ার পেতে দিচ্ছি। গঙ্গার হাওয়া খাও, ডেকে বিহার করো। গঙ্গাজল ফুটিয়ে চা তৈরি হচ্ছে, গুড় মিশিয়ে। খেলে চিত্ত শুদ্ধি হবে।'' সব ভালো যার চা ভালো। কিন্তু চায়ের বর্ণনা শুনে বজ্রাঘাত হলো যাত্রীদের কানে। স্টিমারের একতলা ফেটে পড়ছে ঘর্মাক্ত মানুষের ভিড়ে। স্টিমার ছেড়েছে, প্রভাত তপন আঁধারের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে দৃষ্টি শানাচ্ছে। জল নিয়ে লোফালুফি চলছে স্টিমারের চাকায়।

ক্রমে একটা স্তব্ধতা জমিয়ে আসছে সকলের মনে। টুকরো কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। গঙ্গার বাতাসে মহাপ্রাণী খইস্যে আসছে। ইতিমধ্যে দেখা গেল গঙ্গাজল ফুটানো গুড়ের চা খেয়ে সকলে চরিতার্থ হয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। বিহারের মুখোমুখি এসে সজল হয়েছে বাঙালির বাঁকা দৃষ্টি। ভাই, কতদিন যে গ্রামের হাটে তরী ভেরাইনি মনে পড়ে না। উফ, প্রাণটা হু হু করে। পেটে এত কথা ছিল আগে জানতাম না। আম, জাম, কাঁঠালের বাগান। মধু, মধু, মধু। পেটে তাল ঠুকছে। বুঝবি না! সে বড় ব্যথার দান। শুধু গাছের কুড়াবো, মাটির খাবো। বগল বাজাবো। অন্তিমে আমার যাওয়ার ইচ্ছা এক্কেবারে নাই। ''বুঝেছি কর্তা, বড্ড খিদে পেয়েছে। ওপারে ঘাটে গিয়ে পুরি খেয়ে ভুক্তভোগী হবেন। মিষ্টি পেঁড়া খেলে জীবনের দৃষ্টি পালটে যাবে,'' জানালো স্টিমারের সারেঙ।

এবারে পট পরিবর্তন। সকরীকলি ঘাট। বাংলার চেনা ভূমি ছেড়ে বিহারের অচিন মাটি। স্টিমারের দড়ি ধরে ডাঙার নির্ভরভূমিতে চরণ ফেলা যেন ট্র্যাপিজের মরণখেলা। শ্রীমতিরা টলমল করে জেটি পার হচ্ছেন। সামালো, সামালো।

সকরীকলি ঘাটে তিনটি গরুর গাড়ি অপেক্ষা করছে বরযাত্রীদের জন্য। হৃষ্টপুষ্ট বলদ, শরীরে রঙিন ঝালর দেওয়া। গলায় ঘন্টার কংকনধ্বনি বাজছে। বর যাবে পাল্কি চেপে, গ্রামের অর্কেস্ট্রা বাজবে পেছনে। পাইক, বরকন্দাজ আছে। গ্রামের নগ্নগাত্র কালো ছেলেরা মাটির ধুলো উড়িয়ে পেছনে। বরকর্তা ব্যবস্থাপনাটা দেখে নিয়ে ঘোষণা করলেন, ''নাও উই আর ইন দ্যা হার্টল্যান্ড অফ দ্য কাউ বেল্ট।'' বরযাত্রীর দল ডাঙায় উঠে হাত-পা খেলিয়ে নিচ্ছে, কনের বাড়ি চড়াও হওয়ার আগে একটা খেলোয়াড়ি পরিকল্পনা। মেয়েদের দল জড়সড় অস্বস্তি বোধ করছে এই খোট্টাই দেশে। কপালে কত বিভ্রাট আছে, একটা অজানা আশঙ্কা বুকে।

বরকর্তা চতুর্দিক তদন্ত করে মেয়েদের গাড়িতে উঠে বসতে রায় দিলেন, ''যা হওয়ার তা হবেই, বিলম্ব করে লাভ নেই।'' সাবধানে গরুদের পাশ কাটিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সেঁধিয়ে গেল মহিলারা গাড়ির টোপরের তলায়। সিঁধ কাটবার ভঙ্গীতে যত নিরাপদ দূরে যাওয়া যায়। গাড়ির শেষপ্রান্তে টঙে চড়ে বসেছেন বরের পিসি। ভারসাম্য রক্ষা করা গেল না। গাড়ি পেছন দিকে ডিগবাজি দিল। ফুটবলের মতো গড়াগড়িও দিল মাটিতে কয়েকজন মহিলা। পিসি আবার হাইকোর্টের জাঁদরেল উকিল। গড়িয়ে যাওয়াটা যেমন তেমন নয়, পাশবালিশ, তাকিয়া কুড়িয়ে তোলার মতো। বড় মুখ করে বললেন, 'যস্মিন দেশে যদাচার'।

যাত্রা এগিয়ে চলল। মুজবর গ্রাম, গোয়াগাচ্ছী গাঁও ছাড়িয়ে চলেছে চড়াই-উৎ রাই বেয়ে। গাড়ি থামিয়ে গরুরা পাশের কুটিরের ঘাস-বিচালি মুখে টেনে নিচ্ছে। জমিদারীর খাসমহলে ঢোকার আগেই পাড়াপড়শির পাকা ধানে মই দিতে চায়।

হেমবাবুর দুটি সেপাই লাঠি ঠক ঠক করছে মাটির উপরে, হেঁটে চলেছে গাড়ির পাশে। হাতে তৈলাক্ত মোটা লাঠি, হাঁটুর ওপরে উঠেছে নতুন মোটা ধুতি, উর্ধাঙ্গে ধবধবে নতুন ফতুয়া। নিরুপদ্রব এই গাঁয়ের হাওয়ায় একটা অহেতুক হই হই রই রই না করলে হেমবাবুর প্রশান্ত মেজাজ অশান্ত হয়ে ওঠে। বরযাত্রীর দল গাড়ির টোপরের তলায়। পথে পথে বেলা বেলা বেড়ে গেল। কিষণপুর গ্রাম কাছে আসছে। বাঁশঝাড় বেড়ে চলেছে। গাড়ি একসময় রাস্তার বাঁক ঘুরতেই অদূরে ধরা দিল আমাদের লাল-সাদা দো'তলা প্রশস্ত বাড়ি। গরুগুলো এবার গাড়ি টেনে লম্বা দৌড় দিল

সেইদিকে। দোতলার বারান্দায় এতক্ষণে সারিবদ্ধ মাথা পথ চেয়ে আছে। বরযাত্রীরা এবার সতর্কে বিধ্বস্ত শরীরগুলো যথাসাধ্য মান-সম্মান বজায় রেখে নড়ে চড়ে গুছিয়ে বসেছে।

এবার হাটের ধারে আমগাছগুলির তলায় এসে পড়া গেল। বড়কর্তার পোষা হাতি, হায়দার তার নাম, শিকল দিয়ে পায়ে বাঁধা আছে গাছের গুঁড়িতে। শুঁড়ের নি:শ্বাসের হাওয়ায় দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়। আম গাছের গুঁড়ি তাকে বেঁধে রাখতে ঘাম ঝরাচ্ছে। আহা, অবোলা জীব। তবলা বাজায় হেমবাবুর প্রাণে। শেষবার হাতির পিঠে চড়াও হয়ে, পড়ে গিয়ে পঙ্গু হয়ে গেলেন। ভোল্টেজ কমে গিয়েছে সংসারে। শোয়ার ঘরে শুয়ে আজকাল গৃহি সন্ন্যাসী হয়ে পড়েছেন।

ক্রমশ

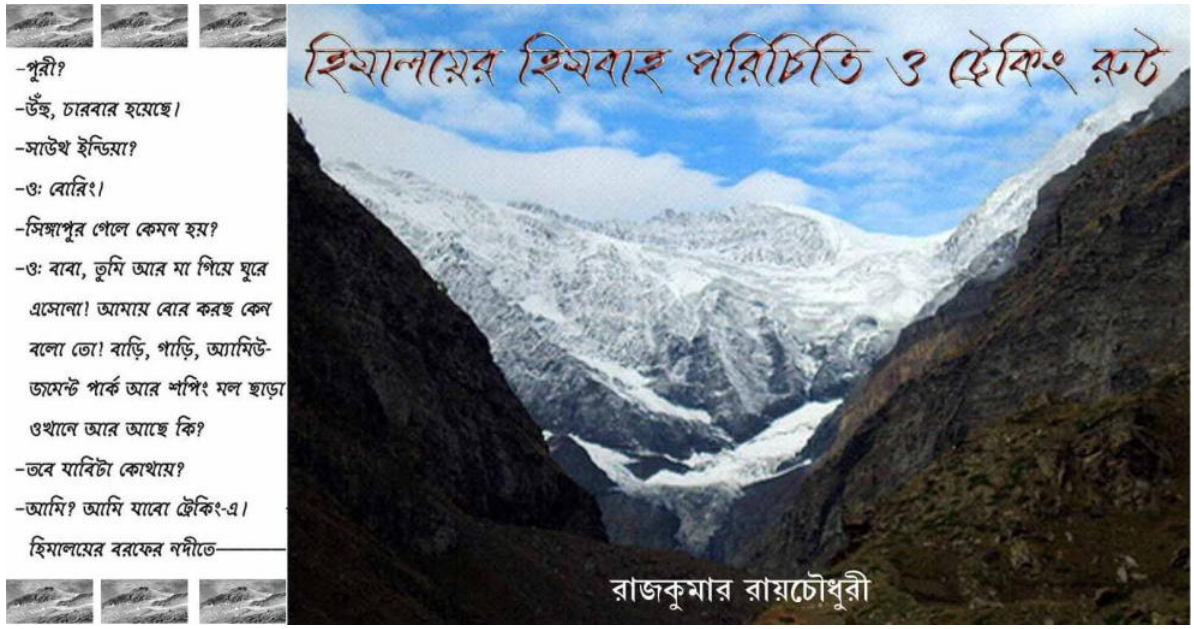

হিমবাহের উৎপত্তি

হিমবাহ-কে বরফের নদী হিসাবে অভিহিত করা যায়। চিরস্থায়ী বরফের এই নদী এত গভীর যে নিজের ওজনের বলেই এটি চলমান। হিমবাহ খুব ঠান্ডা অঞ্চলেই দেখা যায় যেমন মেরুপ্রদেশে অথবা হিমালয়ের উঁচু অঞ্চলে।

এইসব অঞ্চলে তাপমাত্রা অত্যন্ত নীচে থাকার ফলে তুষারপাত হলে তা গলে না।দীর্ঘদিন ধরে তুষার জমতে থাকলে হিমবাহের জন্মের সম্ভাবনা দেখা যায়। তুষারপাতের মাত্রা এমন হওয়া দরকার যাতে গ্রীষ্মকালেও তা না গলে যায়। তুষার আস্তে আস্তে জমা হতে থাকলে এর গঠনের পরিবর্তন হয়। প্রথম যখন তুষারপাত হয় তখন তুষারের ঘনত্ব থাকে ৫০ থেকে ১০০ কিলোগ্রাম প্রতি ঘনমিটারে। ক্রমাগত তুষারপাতের ফলে নীচে চাপা থাকা তুষার গলে যায়, ঘনীভূত হয় এবং ক্রমশ বরফ কণায় পরিণত হয়। তুষারের এই অবস্থাকে বলা হয় ফার্ণ (fern)। এর ঘনত্ব প্রায় ৫০০ কিলোগ্রাম প্রতি ঘনমিটারে। আস্তে আস্তে এই ফার্ণের ঘনত্ব বাড়তে থাকে এবং এটি কঠিন বরফে রুপান্তরিত হয়, তখন এর ঘনত্ব হয় ৯০০ কিলোগ্রাম প্রতি ঘনমিটারে। (জলের ঘনত্ব ১০০০ কিলোগ্রাম প্রতি ঘনমিটারে) এটাই হিমবাহের নীল বরফ। যারা গঙ্গোত্রী হিমবাহ অতিক্রম করেছেন তাদের অনেকেই নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন এই অপূর্ব দৃশ্য।

হিমবাহের এই ঘনত্বের ফলে নিজের ওজনের ভারেই হিমবাহ গলা প্লাস্টিকের মতন খুব আস্তে আস্তে নীচে নামতে থাকে। পর্বতমালার সঙ্গে আপেক্ষিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে হিমবাহগুলিকে দুভাগে ভাগ করা হয়।

একটি দৈর্ঘ্য বরাবর (Longitudinal), অপর ভাগটি হল আড়াআড়ি (Transverse)। দৈর্ঘ্য বরাবর হিম বাহগুলি পর্বতমালার প্রায় সমান্তরাল। অপরদিকে ট্রান্সভার্স (Transverse) হিমবাহগুলি পর্বতমালার সঙ্গে লম্বা ভাবে অবস্থিত। হিমবাহের দুধারের পর্বত থেকে যে সমস্ত ছোট বড় পাথর (Boulders) হিমবাহের উপরে পড়ে তা হিমবাহ দ্বারা বাহিত হয়ে অনেক দূর অবধি যায়। একত্রে স্তূপীকৃত এই সব পাথরের স্তরকে বলা হয় মোরেন (Moraine)।

গাড়োয়ালের হিমবাহ

গাড়োয়াল এখন উত্তরাঞ্চলের অংশ। ভ্রমণার্থী ও তীর্থযাত্রীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় এই স্থান। এর অন্যতম কারণ হল হিন্দুদের কাছে অতি পবিত্র চারটি ধাম বা তীর্থস্থান এখানেই অবস্থিত। এগুলি হল কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী। এছাড়া এর অসংখ্য শৈল শহর, বুগিয়াল ও হিমবাহ সাধারণ ভ্রমণার্থী ও ট্রেকার দুজনেরই কাছে সমান আকর্ষণীয়।

এই সব জায়্গার নৈসর্গিক দৃশ্য অতুলনীয়। গাড়োয়ালে ছোট বড়ো অনেক হিমবাহ থাকলেও প্রথমেই যে নামটি মনে আসে তা হল গঙ্গোত্রী হিমবাহ।

এটি উত্তরকাশী জেলায় অবস্থিত। গঙ্গোত্রী উপত্যকা অনেকগুলি প্রধান হিমবাহের অবস্থিতির জন্য বিখ্যাত। রক্তবরণ, চতুরঙ্গী, বাসুকী প্রভৃতি হিমবাহগুলি এই উপত্যকারই অংশ। চৌখাম্বা পর্বত মালার উত্তর সানুদেশে এদের অবস্থান। গঙ্গোত্রী হিমবাহের সর্বোচ্চ উচ্চতা ৭০০০ মি। এটি গোমুখে এসে শেষ হয়েছে। গোমুখের উচ্চতা প্রায় ৪০০০ মি। গঙ্গোত্রী হিমবাহ ধরে সোজা চলে গেলে জাহ্নবী খাল (১৯৮৬০ ফু) গিরিখাতে পৌঁছানো যায়। এই গিরিখাত অতিক্রম করে বদ্রীনাথ যাবার ট্রেকিং রুট আছে।

গঙ্গোত্রী হিমবাহ - এই হিমবাহটি লম্বায় ৩৩.৬০ কিমি ও সর্বোচ্চ প্রস্থ ২.৪০ কিমি। ভূতত্ত্ববিদদের ম তে গঙ্গোত্রী হিমবাহ আগে বতমান সুখি (গোমুখ থেকে উত্তরকাশীর দিকে ৪০.৫ কিমি দূরে অবস্থিত) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গোমুখের উচ্চতা ৪০০০ মি হলেও এখনো ২৩০০ মি উচ্চতায় মোরেনের দেখা মিলবে।

ট্রেকিং রুট - বেস ক্যাম্প বা মূল শিবির : গঙ্গোত্রী

	উচ্চতা (মি)	দূরত্ব (কিমি)	রাস্তা
হৃষীকেশ - উত্তরকাশী	১১৫০মি	১৫৫কিমি	বাস
উত্তরকাশী - গঙ্গোত্রী	৩২০০মি	১০০কিমি	বাস
গঙ্গোত্রী - গোমুখ	৪০০০মি	১৮কিমি	হাঁটা

হৃষীকেশ থেকে বাসে উত্তরকাশী আসুন। এখানে একরাত কাটান। পরের দিন ঘন্টা ছয়েক বাস বা ট্যাক্সী তে গঙ্গোত্রী পৌঁছন। আগে লঙ্কায় যাত্রীদের থাকতে হত। গঙ্গোত্রী অবধি সোজা বাস চলাচল শুরু হওয়ার পর থেকে লঙ্কার গুরুত্ব কমে গেছে। যাদের হাতে সময় কম তারা হৃষীকেশ থেকে ভোর চারটের বাস ধরে সন্ধ্যা নাগাদ গঙ্গোত্রী পৌঁছতে পারেন। গঙ্গোত্রী থেকে চড়াই পথে ৬ কিমি চলার পর পৌঁছবেন চীরবাসায় (উ: ৩৫৬৭ মি)। বর্ষাকালে এলে ছোট বড়ো অসংখ্য নালা পেরোতে হতে পারে। কতকগুলি বেশ খরস্রোতা।কয়েকজন থাকলে হাত ধরাধরি করে পার হওয়াই ভাল। চীরবাসা থেকে গোমুখ ১২ কিমি। খুব ভোরে রওনা হলে একদিনে গোমুখ দেখে গঙ্গোত্রী ফিরে আসা যায়। তবে সত্যি যদি ভ্রমণের আনন্দ কেউ পেতে চান তবে একরাত্রি ভুজবাসায় থেকে পরদিন গোমুখ দর্শন করে গঙ্গোত্রী ফেরাই শ্রেয়। ভুজবাসায় গাড়োয়াল মন্ডল বিকাশ নিগমের বাংলো রয়েছে, আর আছে সমস্ত বাঙ্গালীর পরিচিত লাল বাবার আশ্রম। এখন পরিবেশ রক্ষার তাগিদে এবং গঙ্গোত্রী হিমবাহ কে উষ্ণায়নের হাত থেকে বাঁচাতে সরকার ওই অঞ্চলে প্রবেশের জন্য কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। গোমুখ যেতে হলে উত্তরকাশী জেলাশাসকের অফিস থেকে অগ্রিম পারমিট

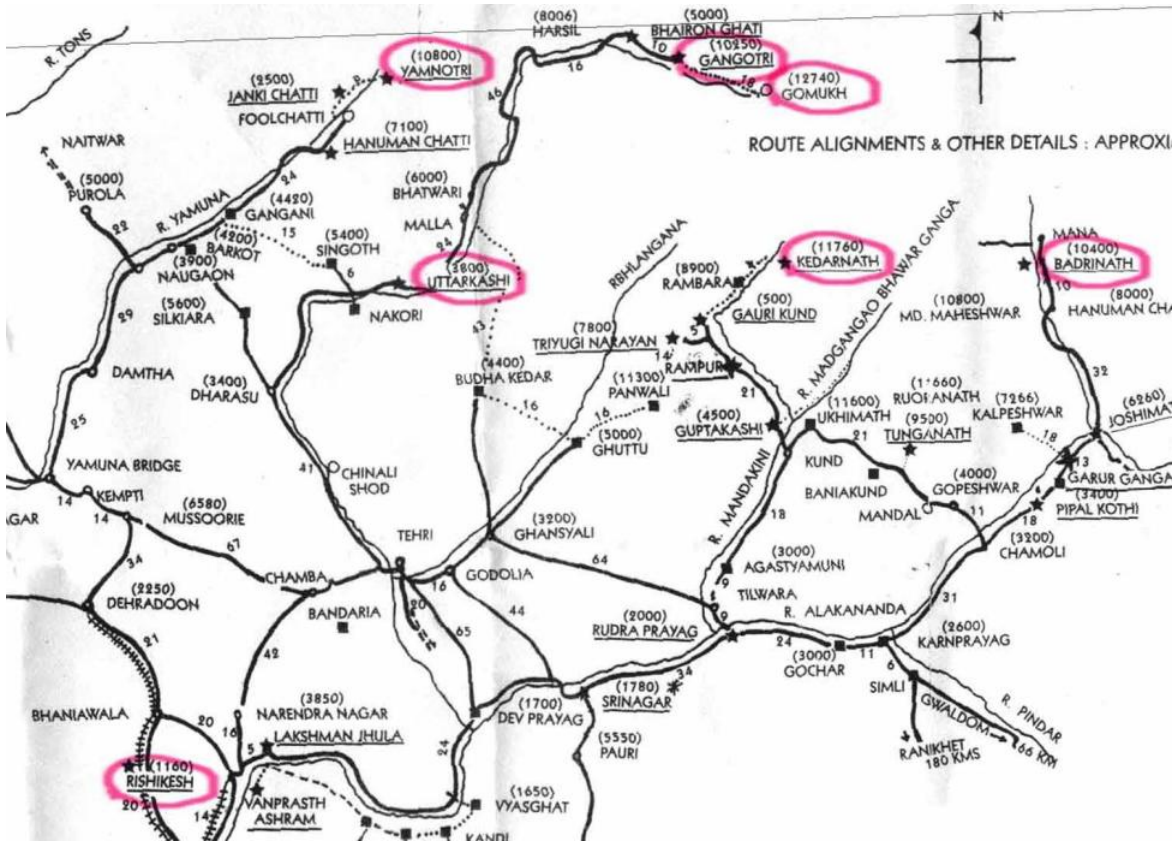

সংগ্রহ করতে হবে। চিরবাসায় থাকবার জায়গা কম। অস্থায়ী সমস্ত দোকান ও থাকার জায়গা তুলে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে তাঁবু থাকাটা সেক্ষেত্রে সবচেয়ে নিরাপদ। গঙ্গোত্রি অবধি যেতে অবশ্য কোন অনুমতি লাগে না।

শুধু গোমুখ দর্শন করে ফিরে গেলে গোমুখে রাত কাটানোর দরকার পরে না। তবে তপোবন বা নন্দন বন যেতে গেলে গোমুখ বা ভুজ বাসায় কয়েক রাত কাটাতে হতে পারে।

তপোবনে যেতে গেলে গঙ্গোত্রী হিমবাহকে আড়াআড়ি ভাবে অতিক্রম করে নুড়ি পাথরের চড়াই ভেঙ্গে ৫ কিমি পথ হাঁটতে হবে। অভিজ্ঞ গাইড খুবই জরুরী। হিমবাহে আছে অজস্র ফাটল (crevasse)যা মৃত্যু ফাঁদের সমতুল্য।

চতুরঙ্গী হিমবাহঃ- এটি লম্বায় প্রায় ৫ কিমি এবং প্রায় ৭৩ বর্গ কিমি জায়গা জুড়ে এর অবস্থান। হিমবাহটির উপর নানা রঙের পাথরের সমাবেশে এটি রঙীন বলে প্রতিভাত হয়। এর নামকরণ ও এই জন্য। গোমুখ থেকে গঙ্গোত্রী হিমবাহের উপর দিয়ে ৬ কিমি চললে চতুরঙ্গীর দেখা মিলবে।

ক্রমশ